অরলান্ডোর চিঠি

বি এম আতিকুজ্জামান

উৎসর্গ

আমার মা খোদেজা পারভিন

আমার বাবা এম আসাদুজ্জামান

যারা পরম মমতায় আমাকে বড় করেছেন এবং এখনো আগলে রাখেন তাদের অকৃপণ ভালোবাসার ডানায়।

ভূমিকা

এক জীবনে অনেক লিখেছি। অধিকাংশই সংগ্রহে রাখি নি। গত কয়েক বছরে 'অরলান্ডোর চিঠি' নামের কলামে সময়ে অসময়ে লিখি। লিখতে ভালো লাগে। যদিও সময় বড়ো কম। আমার জীবনের সবচে দীর্ঘতম সময় কাটাচ্ছি আমেরিকার ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের অরল্যান্ডো শহরে। এ শহরটি সারা

বিশ্বের নাগরিকদের কাছে খুব প্রিয়, ও অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে বিখ্যাত। এ কারণে সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভিন্ন রীতি আর সংস্কৃতির মানুষরা আসে এ শহরে প্রায় সারা বছর। এসব মানুষের প্রতি আমার প্রবল আগ্রহ। তাদের চিকিৎসা সেবা দেবার পাশাপাশি তাদের প্রবাহমান জীবনের টানাপোড়েন নিয়ে আমি লিখি। এ লেখাতে বাস্তব জীবনের দ্বন্দ্বের সাথে আছে আমার সহজ সরল কথামালা।

জীবন নদীর মতো। বাঁকে বাঁকে তার বিস্ময়। আমার চারদিকের সব পরিচিত অপরিচিত মানুষ বিস্ময় নিয়ে প্রতিদিন আমার কাছে আসেন। আমি তাদের বিস্ময় নিয়ে আবেগাপ্লুত হই। তাদের জীবন নিয়েই এসব গল্প-অনুগল্প। আমার প্রথম বইতে আপনাদের স্বাগতম।

বি এম আতিকুজ্জামান
অরলান্ডো, ফ্লোরিডা
পৌষের ২০তম দিবস

গল্পক্রম

শুরুর গল্প এবং নাওমি
আঁধার রাতের তারা
উপগ্রহের স্বপ্ন
মনের আয়না
একজন মমিনা বেগম
একাকি মানুষের গল্প
যেতে- যেতে
বব আর মেরিনার গল্প

একটি সহজ মৃত্যু: একটি সহজ জীবন
মরিস সাহেবের দিনকাল
ঝরে যাই আমি ঝরাপাতা
ডেভিডের সহজ জীবন
যাবো বৈশাখে
মায়ের আঁচল
একটি পরিপূর্ণ জীবন
অলখ-লোকের আলো
মধুর আমার মায়ের হাসি
দেয়ালের মাছি
রোজমেরির আলোকিত জীবন
স্মৃতিভ্রংশ
বৃত্তের বাইরের জীবন
সীমাবদ্ধ জীবনের অসীম ভালোবাসা
শুভ নববর্ষ
মাইকেলের সহজ জীবন
বিজয় দিবস এবং শরাফত সাহেব
নবান্নের সময়
জীবনের দু:খ কষ্ট
নরমার ব্যাগ এবং আমাদের নববর্ষ বরণ
অরলান্ডোর চিঠি: মধুর আমার মায়ের হাসি
দিজয় দিবসের স্মৃতি
ছোট খাটো আনন্দ, ছোট খাটো বেদনা
আজ রবিবার
সংখ্যালঘুর মেঘলা দিন
আশা আর ঝাল মুড়ির গল্প
একটি সূর্যহীন দিন
বাংলা আমার তৃষ্ণার জল
ধন্যবাদ দেওয়ার দিন
শখের জীবন, জীবন শখের
সুতোর টানে
একজন অড্রের গল্প
আর্নল্ড পামারের গল্প
অপ্রয়জনীয় জিনিস
ছবিঘর

অরলান্ডোর গাউচা
জানের সদকা
ইরমা এবং আমরা
একটি বৃষ্টিভেজা সকাল
কুকুর দিবস
শনিবারের গল্প
একজন স্বপ্নদ্রষ্টা
এই রুপালী গিটার ছেড়ে
আমাদের প্রথম বাড়ি
রিকোর ছুরি
অবসরের চিন্তা
জীবনের ছোট বড়
অধ্যাপক মার্শাল এবং একটি অনুপ্রেরণার গল্প
পৃথিবীর আলো আঁধারে

শুরুর গল্প এবং নাওমি

নাওমির চোখ আর পুরো শরীর হলুদ এখন।

খুব অবসন্ন। কথা ঠিক মতো বলতে পারছে না। ওর লিভার কাজ করছে না। এখন লিভার ট্রান্সপ্লান্টের জন্য অপেক্ষা।

আমার ভাবতে আগে কষ্ট হতো কেমন করে এ রকম মেধাবী একজন মানুষ স্রেফ মদের নেশায় জীবনটা শেষ করে দিতে পারে! এখন দেখতে দেখতে সয়ে গেছে।

নাওমি কথা দিয়েছিলো ছ'মাস আগে আর মদ ধরবে না। পারেনি সে কথা রাখতে। বহুবারের মতো।

এরকম একজন প্রাণোচ্ছল মানুষের এমন পরিণতি দেখতে কষ্ট হয়। মনে ভীষণ কষ্ট নিয়ে হাসপাতাল থেকে বের হয়ে যাচ্ছি। মনে পড়লো নাওমি কীভাবে আমাদের সাহায্য করেছিল যখন আমি এ শহরে প্রথম আসি। তা প্রায় বিশ বছর আগের কথা।

অরলান্ডোর ট্রাফিক বেড়েছে। বিশ মিনিটের পথ এখন তিরিশ মিনিট। চেনা পথগুলো গত কুড়ি বছরে বদলে গিয়েছে। চার রাস্তার লেন হয়েছে আট রাস্তা। রাস্তার পাশ ঘেঁষে নতুন নতুন সব বাড়ি-ঘর, ব্যবসা হয়েছে। বেড়েছে অরলান্ডো শহরের আয়তনও। সবচেয়ে বেশি বেড়েছে মানুষ। প্রায় পাঁচগুণ! তবে সুন্দর শহরটির সৌন্দর্য কমেনি একটুও। নিউ ইয়র্ক, লাসভেগাস আর মায়ামির পর অরলান্ডোতেই বেশি মানুষ বেড়াতে আসে আমেরিকায়।

কারণ হলো এর চমৎকার আবহাওয়া, পৃথিবীর সবচে আকর্ষণীয় গেম পার্ক (ডিজনি ওয়ার্ল্ড, ইউনিভার্সাল ষ্টুডিও , সি ওয়ার্ল্ড, লেগো ল্যান্ড সহ এক'শটির ও বেশি), সমুদ্র সৈকত, লেক এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি। এখানে বাড়িঘরের দামও তুলনামুলক কম। আর সম্ভবত এ কারণেই পৃথিবীর প্রায় এক'শটির বেশি দেশের মানুষ এখানে বসবাস করে। আমি এখানে প্রথম এসেছিলাম একটি বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে, ২০০১ সালে। নিউ ইয়র্কের কনকনে শীত আর বরফ ছেড়ে যখন এখানে নামলাম, তখন দেখি ঢাকার শীতকালের মতো অবস্থা। আবহাওয়ার এ চমৎকার পরিবর্তন দেখে আমিতো রীতিমত অবাক।

আমার এক স্কুলের বন্ধু আমার সাথে দেখা করতে এলো সে সময়। আমাকে নিয়ে একটি বাংলাদেশি চাইনিজ রেস্তোরাঁতে আপ্যায়ন করিয়ে সে-ই প্রথম শহরটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিলো। দেখলাম তার চমৎকার ছিমছাম বাড়ি। বাড়ির চারদিকে অনেকটা বাংলাদেশের মতোই আম-জাম, কলা-পেঁপে গাছ। ভীষণ মোহিত হয়ে গেলাম আমি। সেদিনই মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, এ শহরেই গড়বো আবাসন।

পরিপাকতন্ত্র বিশেষজ্ঞের চাহিদা সব সময়ই বেশি। কাজেই খুব সহজেই একটি ভালো চাকরির অফার পেলাম এ শহরে। আমি পরিবারসহ ঘুরতে এলাম। ঘুরে দেখতে এলাম এখানকার লোকালয়, স্কুল, দৈনন্দিন জীবন যাপনের নানা দিক। তখনই পরিচয় হলো নাওমির সাথে। নাওমি একজন রি-লোকেশন কনসালটেন্ট। নাওমির কাজ হলো এ শহরে কেউ নতুন এলে তাকে এই শহরটার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া। বাসাবাড়ি ভাড়া বা কেনা থেকে শুরু করে বাচ্চাদের স্কুল, গ্রোসারি, রেস্তোরাঁ, থিয়েটার সব তার নখদর্পনে।

প্রথম দেখাতেই নাওমি এ শহরের আদ্যোপান্ত বলে দিলো আমাদের।

অরল্যান্ডোর ইতিহাস শুরু ১৮৩৮ সালে, সেমিনোল যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে। মার্কিন সেনাবাহিনী আদিবাসিদের আক্রমণ থেকে বসতি স্থাপনকারীদের রক্ষা করার জন্য বর্তমান অরল্যান্ডো সিটির সীমানার দক্ষিণে ফোর্ট গ্যাটলিন তৈরি করে।

১৮৪০ সাল নাগাদ দুর্গের চারপাশে একটি ছোট বসতি গড়ে উঠেছিল। এটি শুরুতে পরিচিত ছিল জার্নিগান নামে। জার্নিগান পরিবারের নামে নামকরণ

করা হয়েছিল এর, যারা এই এলাকায় প্রথম স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছিল। জার্নিগানের একটি পোস্ট অফিস ছিল, ৩০ মে, ১৮৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ছয় বছর পরে বসতি উত্তর দিকে প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে, আনুষ্ঠানিকভাবে এ বসতির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'অরলান্ডো'।

১৯৫৭ সালে, মার্কিন ডাকঘর এ নাম পরিবর্তন গ্রহণ করে। অরলান্ডো শহরটি ১৮৭৫ সালে ৮৫ জন বাসিন্দা নিয়ে গঠিত হয়েছিল, যাদের মধ্যে ২২ জন ছিলেন যোগ্য ভোটার।

অরলান্ডো নামটি ঠিক কোথা থেকে এসেছে সে সম্পর্কে ইতিহাস তেমন স্পষ্ট নয়। তবে এর নামকরণ নিয়ে চারটি গল্প শোনা যায় প্রায়ই। এর একটি গল্পের সাথে বিচারক জেমস স্পিয়ার জড়িত, যিনি অরলান্ডোকে কাউন্টি আসন হিসাবে পেতে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। অরলান্ডোকে এমন একজন ব্যক্তির নামে নামকরণ করেছিলেন তিনি, যিনি একবার তাঁর পক্ষে কাজ করেছিলেন। আরেকটি জনপ্রিয় গল্প হলো– স্পিয়ার মূলত শেক্সপিয়রের একটি চরিত্রের নামানুসারে এটির নামকরণ করেছেন, "যেমন আপনি এটি পছন্দ করেন"।

তৃতীয় গল্পটিতে শোনা যায়, মিঃ অরলান্ডো নামের এক ভদ্রলোক ছিলেন। যিনি ষাঁড়ের কাফেলা নিয়ে রওনা করেছিলেন টাম্পায়। বলা হয়, সেই যাত্রাতেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, মারা গিয়েছিলেন এবং তাকে সমাহিত করা হয়েছিল। তার মৃত্যু ও সমাধীকে কেন্দ্র করেই লোকেরা জায়গাটির পরিচয় করানো শুরু করে অনেকটা এভাবে– "ওখানে অরল্যান্ডো আছে।"

অরলান্ডোর নামকরণ নিয়ে চূড়ান্ত তত্ত্বটি সেমিনোল যুদ্ধের মাঝামাঝি সময় কর্তব্যরত সৈন্যদের একটি কোম্পানি সম্পর্কে। মিনি হ্রদের (বর্তমানে চেরোকি) পূর্ব দিকের জলাভূমিতে আদিবাসিদের সাথে যুদ্ধ করার পর, সামরিক বাহিনী সেখানে রাতের জন্য বসতি স্থাপন করে। সেন্টিনেল অরলান্ডো রিভস যখন ক্যাম্প পাহারা দিচ্ছিলেন, তখন তিনি তার দিকে হঠাৎ একটি কাঠের লগ ভাসতে দেখেন। তার বুঝতে বাকি থাকে না, লগটা আসলে কী। আদিবাসীদের ছদ্মবেশ চিনতে পেরে সহকর্মী সৈন্যদের সতর্ক করার উদ্দেশ্যে সাথে সাথে তিনি তার হাতের বন্দুকটি ছুঁড়ে মারেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে আদিবাসীরা। তাদের বিক্ষিপ্ত তীরগুলো একের পর এক এসে পড়তে শুরু করে দরিদ্র লোকটির ওপর। এখানেই প্রাণ হারান তিনি। এই অরলান্ডো রিভসকে সমাধিস্থ করার জন্য ইওলা লেকের দক্ষিণ দিকটি বেছে নেওয়া হয়েছিল।

এখানেই শহরের শুরু।

অরলান্ডো, ফ্লোরিডা ডিজনি ওয়ার্ল্ড এবং ইউনিভার্সালের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত, তবে এটি ছাড়াও আরও অনেক কিছুর জন্য পরিচিত এই শহর। প্রতি বছর কেন্দ্রীয় ফ্লোরিডা অঞ্চলটি প্রায় ৬০ মিলিয়ন পর্যটক আকর্ষণ করে,

যার অধিকাংশই আসে এখানকার উষ্ণ জলবায়ু, বিশ্ব-বিখ্যাত থিম পার্ক, শপিং মল, গল্ফ কোর্স এবং রোমাঞ্চকর নৈশযাপনের জন্য। অনেকে সমুদ্র সৈকতে ঘোরার উদ্দেশ্যেও আসে এখানে, কারণ আমেরিকার সেরা কিছু সমুদ্র সৈকত অরলান্ডোর প্রায় নাগালেই।

থিম পার্ক অনুসারে, ডিজনি ওয়ার্ল্ড এবং ইউনিভার্সাল স্টুডিওতে মন মতো পছন্দসই সবই পাওয়া যায়। সেইসাথে লেগোল্যান্ড, অ্যাকুয়াটিকা এবং গ্যাটরল্যান্ড- মাত্র কয়েকটি নাম। অরলান্ডো অবকাশকালীন আবাসের বেশিরভাগ ডিজনি ওয়ার্ল্ড থেকে কয়েক মিনিটের দূরত্বের মধ্যে। তাছাড়া এখানকার শীর্ষস্থানীয় রিসোর্টগুলো এবং অরলান্ডোর অন্যান্য আকর্ষণগুলো সহজ নাগালের মধ্যে অবস্থিত।

এই থিম পার্কগুলো বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত, তাই এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে কেন হাজার হাজার মানুষ অরলান্ডোকে তাদের ভ্রমণের তালিকার একেবারে শীর্ষে রেখেছে। থিমপার্কগুলোর মধ্যে ডিজনি ওয়ার্ল্ড সাধারণত সর্বাধিক জনপ্রিয়। এর ভেতরে চারটি অবিশ্বাস্য পার্ক রয়েছে, যার প্রতিটিতে আছে তাদের নিজস্ব থিম। এখানে রয়েছে বিশ্ববিখ্যাত ম্যাজিক কিংডম, ওয়াইল্ড এ্যানিমাল কিংডম, তারকা খচিত হলিউড স্টুডিও এবং গ্লোব-ট্রটিং। যে কেউ চাইলে কোনো ধরনের বিরক্তি ছাড়াই ডিজনি ওয়ার্ল্ডে বেশ কয়েক সপ্তাহ টানা কাটিয়ে দিতে পারে।

ইউনিভার্সাল স্টুডিও-ও সকলের জন্য একটি প্রধান পর্যটন গন্তব্য এখানে, যার সাথে জড়িয়ে আছে হ্যারি পটারের অবিশ্বাস্য জাদুর বিশ্ব। থিম পার্কের মধ্যে এ পার্কটি এত অবিশ্বাস্য যে, এখানে প্রবেশ করলে যে কেউ খুব সহজেই অনুভব করবে যে সে নিজেই ঢুকে গেছে বইয়ের পাতায়। হ্যারি পটার সিরিজ পছন্দ করেন, এমন সকলের কাছেই এটা অত্যন্ত প্রিয়।

থিম পার্কগুলো থেকে একটু দূরে এগোলেই আবিষ্কার করা যাবে ডাউনটাউন অরলান্ডো। যা আসলে অনেকটা আমাদের পুরান ঢাকার মতো 'আসল অরলান্ডো'। স্থানীয়দের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ও ভালোবাসার জায়গা এটা। আরো সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে ডাউনটাউন অরলান্ডো হলো এই অঞ্চলের প্রধান আকর্ষণ। সেন্ট্রাল ফ্লোরিডার বৃহত্তম নগর কেন্দ্রও এটি। এখানকার সুদৃশ্য আকাশচুম্বী ভবন, ক্রীড়া কেন্দ্র, থিয়েটার, আর্ট গ্যালারী, শপিং সেন্টার এবং এবং পার্কগুলো সব সময় লোকে লোকারণ্য হয়ে থাকে। প্রায় হাজারের ওপরে দুর্দান্ত সব রেস্তোরাঁ রয়েছে এখানে। আছে আয়েশী নৈশযাপনের ব্যাপক বন্দোবস্ত।

অরল্যান্ডোর আরেকটি এলাকা ইন্টারন্যাশনাল ড্রাইভ নামে সুপরিচিত। ডাউনটাউন থেকে মাত্র কয়েক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এটি। দশ মাইলেরও বেশি এলাকা ধরে বিস্তৃত। আই-ড্রাইভ হলো বিখ্যাত অরেঞ্জ কাউন্টি কনভেনশন

সেন্টার, যার মূলে রয়েছে অরলান্ডো বিনোদন কমপ্লেক্স। এখানকার বিভিন্ন ফান স্পট, আমেরিকা পার্ক বহু মানুষের আকর্ষণের প্রাণকেন্দ্র।

সব দিনভর সব ঘুরেফিরে দেখা শেষে অবশেষে নাওমি আমাদের নিয়ে এলো ডাক্তার ফিলিপ্স নামের এক চমৎকার এলাকাতে। আর্নল্ড পামার পঞ্চাশ বছর আগে হ্রদ আর ছোট পাহাড়ের মাঝে বিশ্বখ্যাত এক গল্ফ কোর্স এবং কান্ট্রি ক্লাব গড়ে তোলেন। নাম দেন 'বে হিল'। সেখানেই একটি বাড়ি পছন্দ হলো আমাদের। সে বাড়ির কথা পরে হবে। আপাতত নাওমির কথাই হোক।

নাওমি প্রচণ্ড সাহায্য করেছিল আমাদেরকে। সে হয়ে গিয়েছিল আমাদের বন্ধু।

ডিভোর্সী, মদাসক্ত মায়ের সাথে বেড়ে ওঠা, কোন্টাকি থেকে আগত মেয়ে নাওমি। জীবনে অনেক চড়াই উতরাই পেরিয়ে অরলান্ডোতে থিতু হয়েছে সে। ছোট বেলায় মা'কে নিয়মিত মাদক গ্রহণ করতে দেখে শৈশব থেকে মদাসক্তি ছিল তারও। কিছু ব্যাক্তিগত ট্রাজেডি তাকে সে বৃত্ত ভেঙে বেরোতে দেয়নি কখনো।

আমি অনেক চেষ্টা করেও সফল হইনি। তবুও হাল ছাড়িনি। এখনো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এ শহরে যাকে দিয়ে আমাদের শুরু, তাকে হারাতে চাই না কখনোই। নাওমির চোখের দিকে তাকালে স্বপ্ন, মায়া আর মতিভ্রমের চিহ্ন দেখি।

আঁধার রাতের তারা

দিন ছোটো হয়ে যাচ্ছে আজকাল। আঁধার থাকতে থাকতে বেরোই ঘর থেকে। যখন ঘরে ফিরি, তখনও আঁধার হয়ে যায়। তাই তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরার একটা তাড়া থাকে আজকাল। তাতে করে, কোনোরকমে যদি একটু দিনের আলোর ছোঁয়া পাই।

আজও দিনটা সেভাবেই যাচ্ছিল। এর মাঝে বাধ সাধলেন আমার এক চিকিৎসক বন্ধু এমানুয়েল। তার একটি মুমূর্ষু রোগি হাসপাতালে আছে। তিনি সে রোগিটিকে দেখার জন্য অনুরোধ করছেন। হাসপাতালের 'এথিকস কমিটির' সদস্য হিসেবে আমাকে যেতে হবে সে রোগীটিকে দেখতে।

আমার অফিস থেকে বেরিয়ে হাসপাতালে যাবার রাস্তা বড়ো সংক্ষিপ্ত। সুন্দর খেজুর গাছের সারি আর তার মাঝে কাশ বন। কাশগুলো লালচে রঙের। শেষ বিকেলের রোদে তাদের অদ্ভুত সুন্দর লাগছে।

গাড়ি থেকে নেমে সিঁড়ি ভেঙ্গে তিন তালায় পৌঁছালাম। হাসপাতালের এ ওয়ার্ডের সবগুলো রুম থেকে খেজুর গাছের সারিগুলো আর কাশবন চোখে পড়ে। সব মুমূর্ষু রোগিরা সে দৃশ্য দেখতে পারে না। এখানকার প্রায় সব রোগিই অচেতন। দেখার অবস্থায় তারা থাকে না। তবে রোগির কাছের মানুষ সে গুলো দেখতে পারেন। পড়ন্ত সূর্যের আলোতে সে দৃশ্য বড়ো সুন্দর। হাসপাতালের এই যমে-মানুষে টানাটানির ভেতরও সে দৃশ্য মনে খানিকটা স্বস্তি এনে দেয়।

রোগিটির নাম অজিত। পেশায় একজন প্রকৌশলী। বয়স মাত্র ত্রিশ বছর। ভারতের কেরালা থেকে অরলান্ডোতে এসেছে পাঁচ বছর আগে। এখানে বড়ো এক প্রতিষ্ঠানে কাজ নিয়ে এসেছিল। মাস তিনেক আগে কেরালাতে গিয়ে তার দীর্ঘদিনের প্রেমিকা অণুকে বিয়ে করে এনেছে অজিত।

দু'দিন আগে সারা দিন ধরে মহা উৎসাহে তারা প্রস্তুতি নিয়েছে 'কালাবাসি দ্বীপে' যাবার। সেখান থেকে 'হানিমুন দ্বীপ'। হঠাৎ রাতে তার প্রচণ্ড মাথাব্যথা হলো। দুটো বাথের বড়ি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। ভোর সকালে অজিত আর ঘুম থেকে ওঠে না। ওকে সাথে সাথে হাসপাতালে আনা হলো।

কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে অজিতের। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে তার নিজের শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার ক্ষমতা নেই আর। তাকে এখন কৃত্রিমভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস চালান হচ্ছে। তার কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র কাজ করছে না। টিকে আছে কেবল যন্ত্রের ওপর! তার শরীর থেকে যন্ত্র সরিয়ে নিলেই সব শেষ!

অণু কাঁদছে। কেঁদে কেঁদে তার চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছে। অজিতের সব চাইতে কাছের মানুষ অণু। অণু সিদ্ধান্ত নিয়েছে অজিতের দেহ আর তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো কিছু মুমূর্ষু মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য দান করে দেবে সে। অজিত বেঁচে থাকবে অনেকগুলো মানুষের মাঝে।

অণুর মুখের দিকে তাকানোর সাহস আমার নেই। আমার গলা ভারী হয়ে আসছে।

'এথিকস কমিটির' কাগজে স্বাক্ষর করে কোনভাবে নিচে নেমে এলাম।

এতক্ষণে সন্ধ্যা নেমেছে। আজ জ্যোৎস্না রাত। কাশবন আর খেজুর বীথির মাঝে আলোর বন্যা বইতে শুরু করেছে।

আজ বোধ হয় চাঁদটা না উঠলেই ভালো হত। আঁধার রাতে তারাগুলো জ্বলজ্বল করে বড়ো বেশি। সে সব তারার মাঝে অণুরা অজিতদের খুঁজে ফেরে।

উপগ্রহের স্বপ্ন

জেফ আমার অফিসে এলে আমার অফিসের সহকারীরা সজাগ হয়ে যায়। ও একজন নভোবিজ্ঞানী। সে জন্য নয়। কারণ হলো আমি জেফের সাথে কথা বলার সময় আমার সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।

জেফ আমার এক যুগেরও বেশি সময়ের পরিচিত। ও আমার অফিসে এলে তার চিকিৎসা সেবার বাইরে বিস্তর আলাপ হয় আমাদের।

জেফের জন্ম ফ্রান্সে। ছোটবেলায় তাঁর মা বাবার সাথে আলাবামার একটি ছোট শহরে চলে আসে তাঁরা। তাঁর বাবা ছিলেন গণিতের অধ্যাপক। মা কাজ করতেন ব্যাঙ্কে। ছোটবেলা থেকেই জেফের স্বপ্ন নভোবিজ্ঞানী হবার।

এমআইটি নামের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার পরপরই নাসাতে গবেষণার কাজ পেয়ে গেলো সে। নাসা অরলান্ডো থেকে চল্লিশ মিনিটের পথ। জায়গাটার নাম 'কেপ কানেভেরাল'। আটলান্টিকের পাশে হাজার হাজার বর্গমাইল জায়গা নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে এ বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানটি।

সারা জীবনের স্বপ্ন তাঁর বাসা পেলো নাসাতে। দীর্ঘদিন কাজ করেছে নভোযান তৈরিতে। আমার মহাকাশ নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন। তার খানিকটার উত্তর সে আমাকে দিয়ে যায় মাঝে মধ্যে। জেফের সুবাদে দু'বার নাসার রকেট উৎক্ষেপণ দেখবার সুযোগ পেয়েছি আমরা।

বছর চারেক আগে নাসার কাজ ছেড়ে 'স্পেস এক্স' নামের এক বেসরকারি নভোযান তৈরি করার প্রতিষ্ঠানে বড়কর্তার কাজ নিয়েছে সে। বেসরকারি খাতে নভোযান গবেষণার বিস্তর সুযোগ এখন। এমনকি নভোচারী না হয়েও এসব বেসরকারি নভোযানে চড়ে মহাকাশে ঘুরে আসা যায়, যদি বিস্তর টাকা থাকে।

এখন তার প্রতিষ্ঠান মহাশূন্যে উপগ্রহ পাঠাচ্ছে নিয়মিত। সবচে প্রথম উৎক্ষেপণটি সফল হয়নি তাঁদের। তবে তাঁর জীবনের সবচে বড়ো শিক্ষাই ছিল, 'না হারলে জিতবে কেমন করে?'

জেফ একদিন আমাকে বলেছিল প্রায় এক হাজার দুইশর মতো উপগ্রহ মহাশূন্যে আছে। অর্ধেকেরও বেশি উৎক্ষেপিত হয়েছে কেপ কানেভেরাল থেকে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের, এমনকি অনেক প্রতিষ্ঠানের উপগ্রহ এখান থেকে উৎক্ষেপিত হয়। একদিন জেফ আমার অফিসে ফোন করে আমার সহকারীকে জানালো আমি যেন তাঁকে সময় সুযোগ করে একটি ফোন করি। আমি ফোন করতেই প্রায় চিৎকার করে সে আমাকে জানালো, তাঁদের প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের প্রথম উপগ্রহটি উৎক্ষেপণের দায়িত্বভার নিয়েছে।

আমি ভীষণ উল্লসিত। আমার আবদার সেই নভোযানটি দেখবার। জেফ জানালো উপগ্রহের মূল অংশটি তৈরি হচ্ছে অন্য একটি জায়গাতে। উৎক্ষেপণের নভোযানটি তৈরি করছে তাঁরা। ভীষণ আগ্রহে আমাদের পুরো পরিবার দেখতে গেলাম সেটি।

বাংলাদেশের ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী তারানা হালিম এসেছিলেন নাসাতে তখন। ভাগ্যক্রমে তাঁর সাথে কথা হলো আমাদের। সেবারই স্বাধীনতার মাস, মার্চে উপগ্রহটি উৎক্ষেপিত হলো। উপগ্রহের নাম 'বঙ্গবন্ধু'।

এর চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে?

স্বাধীনতার মাস মার্চে এক দঙ্গল বাংলাদেশিদের নিয়ে নাসাতে গিয়েছিলাম বাংলাদেশের প্রথম উপগ্রহ 'বঙ্গবন্ধু' উৎক্ষেপণের স্মরণীয় মুহূর্তটি মনে রাখার জন্য। বাংলার বঙ্গবন্ধুকে আকাশপানে ছুটতে দেখে সমস্বরে সবাই গেয়ে উঠেছিলাম– "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।"

মনের আয়না

লিসার সাথে আমার পরিচয় প্রায় এক যুগ।

যেদিন ওকে প্রথম দেখেছিলাম, প্রায় চমকে উঠেছিলাম আমি। ওর সারা মুখটা কে যেন ঝলসে দিয়েছে। ও নিয়ে এসেছিলো একজন প্রাপ্তবয়স্ক শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী রোগিকে। ওর সাথে প্রথম পরিচয়ে আমি অবাক হয়েছিলাম তার মানবিকতা দেখে। সে ওই প্রতিবন্ধী মানুষটিকে সারা জীবন লালন পালনের ভার নিয়েছে। লিসা তার চিকিৎসা সেবার নাঁড়ী নক্ষত্রের খবর রাখেন পুংখানুপুংখভাবে। আমি তার পালিত পুত্রের প্রতি তার ভালোবাসা আর সেবা দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। প্রথম পরিচয়েই তাকে জিজ্ঞেস করতে পারিনি তার মুখে কী হয়েছিল?

কিছুদিন পর লিসা আরো একটি মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী রোগি নিয়ে এলো। জানালো একেও সে লালন পালন করছে তার সন্তানের মতো। প্রতিবন্ধী সন্তানদের প্রতি তাদের মায়ের সম্পর্ক হয় ভীষণ গভীর। এটি আমার দীর্ঘদিনের পর্যবেক্ষণ। লিসার ক্ষেত্রে এ ভালোবাসাটি একেবারেই নিরেট সত্যি।

আস্তে আস্তে দেখলাম লিসা পাঁচটি মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী মানুষকে বড়ো করছে। অদ্ভুত ব্যাপার হলো ওরা প্রত্যেকেই ভীষণ বন্ধুসুলভ এবং বন্ধুপ্রবণ। আমি লিসাকেই এর কৃতিত্ব দেব। ওর মতো কোমল প্রাণের মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। অনেক বার ভেবেছি লিসাকে জিজ্ঞেস করবো, কি হয়েছিল তার মুখে? কিন্তু সে আমার রোগি নয় বলে এ ব্যাক্তিগত প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়েছি।

আজ লিসা আমার অফিসে এসেছে তার নিজের জন্য। লিসার সাথে কথা বলে আমি স্থির হয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। লিসার জীবনটা গল্পের চাইতেও গল্পময়!

ও জন্মেছিল মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ছোট এক শহর রাভিনাতে।

রাভিনা নামের এ নাম না জানা ছোট্ট শহরে বিত্তহীন এক পরিবারে তার জন্ম। বাবা মার পাঁচটি সন্তানের একজন সে। মাদকাসক্ত মায়ের দুটি সন্তানই ছিল শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী। আর তাই ছোট বেলা থেকেই লিসা শিখে গিয়েছিল কীভাবে তাদের পরিচর্যা করতে হবে।

টানাপোড়েনের সংসারে মাকে সে হারালো অল্প বয়সে। প্রতিবন্ধী দুই ভাইবোন ও মারা গেল তারপর। অল্প বয়সে এতো বড়ো আঘাত তাকে ভেঙে ফেলেনি। লিসা তার জীবনের লক্ষ্য স্থির করে ফেললো তখনই। সে তার সারা জীবন প্রতিবন্ধীদের সেবার জন্য উৎসর্গ করে দিলো। তারপর শিকাগোতে চলে

এলো অল্প বয়সেই। কঠোর পরিশ্রমের পাশাপাশি লেখাপড়া চালিয়ে নিয়ে গেল সে।

প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষক হয়ে গেল সে সাতাশ বছর বয়সে। জাতিসংঘের এক প্রকল্পে কাজ নিয়ে চলে গেল পেরুতে। প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য একটি আবাসিক প্রকল্পে কাজ শুরু হলো তার।

ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! সড়ক দুর্ঘটনাতে পড়ে মরতে মরতে বেঁচে গেল লিসা। কিন্তু সারা জীবনের জন্য বিকৃত হয়ে গো তার মুখ। তাকে ফিরে আসতে হলো এদেশে। জাতিসংঘ থেকে তাঁকে একটি এককালীন অনুদান দেয়া হলো। সেটি নিয়ে দু'যুগ আগে এ শহরে এসেছে সে।

এসেই খুঁজে বের করেছে পাঁচটি মানসিক আর শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুকে। যাদের প্রত্যেকেই পরিত্যাক্ত হয়েছিল।

লিসা তাদের বড় করে তুলছে পরম মমতার সাথে, একেবারে মায়ের যত্নে। লিসার মুখটি তাদের সবচে প্রিয় মুখ। ওর গল্প শুনে আমি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম লিসার মুখের দিকে। ওর দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া মুখটাই আমার মনে হলো পৃথিবীর সবচে আলোকিত একটি মুখ। লিসার মুখটা যেন স্বর্গের প্রতিচ্ছবি। তাকে দেখছি, আর মনে পড়ছে একটা গান :

"মুখ দেখে ভুল করো না–
মুখটা তো নয় মনের আয়না..."

আমার আজকের আকাশের তারারা

ক্লাস নেবার জন্য আজ মেডিকেল কলেজে এসেছি। অফিসে ঢুকেই দেখি লিজ মুখ গোমরা করে বসে আছে। ও মেডিকেল কলেজে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী। আমি ওর মেন্টর বা পরামর্শদাতা। এখানে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর একজন 'মেন্টর' আছে। সময়ে-অসময়ে , বিপদে-আপদে মেন্টর তাদের সাহায্য করে, বুদ্ধি বাতলে দেয়।

লিজ খুব বুদ্ধিমতি ও বড় হৃদয়ের একটা মেয়ে। ও বড় হয়েছে আটলান্টাতে। ওর বাবা ও একজন ডাক্তার। মেডিকেল কলেজে ঢোকার আগে সে তানজানিয়ার এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে দরিদ্র মানুষের সেবা করেছে দীর্ঘ তিন মাস। বাংলাদেশ সম্পর্কে ওর ভীষণ কৌতূহল। তার ইচ্ছে সে এক দু'মাসের জন্য বাংলাদেশে যাবে দরিদ্র মানুষকে চিকিৎসা সেবা দিতে।

লিজের মন আজ খুবই খারাপ। ওর এনাটমি ক্লাসের মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ শুরু হবার পর থেকে মনটা ভালো যাচ্ছে না তার। এ দেশের মেডিকেল কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের শব ব্যবচ্ছেদের জন্য যে দেহগুলো বাবহৃত হয়, তার সবগুলোই দানকৃত। অর্থাৎ একজন মহৎ মানুষ মানব সেবার জন্য দান করে গিয়েছেন তার দেহ।

এখানে দেহ ব্যবচ্ছেদের আগে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে জানানো হয় এই দেহটি কার, তার জীবন বৃত্তান্ত। যে মানুষের দেহ তাদের ক্লাস আজ ব্যবচ্ছেদ করা হবে, তার জীবনটা ছিল বড় সংক্ষিপ্ত। মাত্র ২৩ বছর বয়সে একটি মারত্মক রোগে সে চলে যাবার আগে তার দেহখানা দান করে দিয়ে যায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্য। লিজের মন খুব খারাপ মূলত ২৩ বছর বয়সী সেই মানুষটার জন্য। সময় নিয়ে তাকে বোঝালাম আমি। আমাদের মনবিজ্ঞানীর কাছে যেতে বললাম একটু আলাপ করার জন্য। যাবার আগে লিজ ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল।

আজকের ক্লাস শেষ করে বাইরে বেরুলাম। ফাঁকা করিডোর ধরে হাঁটছি আর লিজ ও প্রাণহীন এক মহাপ্রাণের কথা ভাবছি। কী বিচিত্র এই মানুষের জীবন। তারচেয়েও বিচিত্র এই মানুষগুলো!

আমার মেডিক্যাল কলেজে প্রথম বর্ষে পড়বার সময়কার কথাটা মনে পড়ে গেলো। আমাদের শব ব্যাবচ্ছেদ ঘরের বাইরে একটা বড়ো বাক্সে ফরমালিনের মাঝে বেশ কটি মৃতদেহ সংরক্ষিত থাকতো। শুনেছি সেসব দেহগুলোকে কেউ কোনো দিন দাবি করেনি। আরেক কথায় ওগুলো সব ছিল 'বেওয়ারিশ লাশ'। সেই বেওয়ারিশ দেহগুলো কাটাছেড়া করে ডাক্তার হয়ে গেলাম আমরা।

আমি কোনোদিন সে সব লাশের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের কথা এভাবে ভাবিনি। তারা কি জীবদ্দশাতে ভেবেছিল তাদের দেহের পরিণতি। তাদের নিকটজন কি ভেবেছিল তা ? ভাবতেই মনটা উথাল পাঠাল হয়ে গেল!

আমার মেডিকেল কলেজের চারদিকে কাশবন। বাতাসে এলোমেলো সেই কাশবনের মাঝে সরু রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনটা বিষণ্ন হয়ে এলো। এ কাশবনটা উৎসর্গ করা হয়েছে অসামান্য কিছু মানুষের জন্য, যারা তাদের দেহ চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য দান করে গিয়েছেন। অন্ধকার নামছে চারদিকে। তারা উঠছে আকাশে। আকাশের তারাগুলো দেখতে দেখতে হাঁটছি আমি। মেডিকেল কলেজের সেসব নাম না জানা বেওয়ারিশ মানুষগুলোকে আমার একেকটি তারা মনে হলো। আজ এই ভরসন্ধ্যে বেলায় নতুনভাবে যেন দেখলাম তাদের। দিনের আলোয় 'তারা' দেখা যায় না।

একজন মমিনা বেগম

মমিনা বেগম মাথা নিচু করে বসে আছেন।

আঙ্গুল দিয়ে টেবিলের ওপর আঁকাজোকা করছেন। কী যে আঁকছেন তা আমি বুঝতে পারছি না। মাঝে মধ্যে মনে হচ্ছে সূর্য, কখনো মেঘ, কখনো ফুল। চোখ দিয়ে পানি পড়ছে তাঁর। মুখ বেয়ে চিবুক গলে সে পানি টেবিলের ওপর পড়ছে। আমি কথা বলার চেষ্টা করছি। কিন্তু তিনি কেঁদেই চলেছেন।

মমিনা বেগমকে চিনি না আমি। কখনো তাঁকে দেখিনি আগে। খুব অসহায় বোধ হতে লাগল আমার।

আমাদের মাথার ওপর খুব উজ্জ্বল একটি বাতি জ্বলছে। এ রুমে একটিমাত্র দরজা। একটি কালো কাঁচের জানালা। ও পাশ থেকে কে দেখছে আমাদের বোঝার কোন উপায় নেই। আমাদের রুমের এক কোণায় একটি ভিডিও ক্যামেরা আমাদের দিকে চেয়ে আছে।

মমিনা বেগমের পায়ে ডাণ্ডা বেড়ি। হাতের কড়া খুলে দেয়া হয়েছে। তাঁর বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। দেখে মনে হয় সত্তুর। কমলা রঙের আপাদমস্তক ঢাকা একটি উদ্ভট পোষাকে তাঁকে ভিন গ্রহের প্রাণীর মতো লাগছে। মাথার চুল প্রায় সাদা। ছোট করে কাটা চুলে অবহেলা আর অপুষ্টির ছোঁয়া। কপালে একটা কাটা দাগ। কানের দুলগুলো নেই।

আমি কোনদিন জেলখানাতে আসিনি। এখানে যে আসতে হবে কোনদিন তাও ভাবিনি। আমার ডাক্তার বন্ধু জর্জ কারাগারের চিকিৎসক হিসেবে কাজ করে। মাঝে মধ্যে কোন কয়েদি হাসপাতালে ভর্তি হলে সে আমাকে সাহায্যের জন্য ডাকে। সে এ শহরের একজন নামকরা প্রাথমিক চিকিৎসক।

গতকাল আমাকে সে ফোন করে বলেছে,

'আমাদের জেলে একজন বাংলাদেশি রোগি ভর্তি হয়েছে। সে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। কেউ তাঁকে রাজি করাতে পারছে না। তাঁকে এখান থেকে কোন মানসিক চিকিৎসা কেন্দ্রে পাঠানোর আগে তুমি কি তাঁর সাথে একটু কথা বলতে পার?'

আমার জন্য জর্জ বিশেষ অনুমতি নিয়েছে জেলার সাহেবের কাছ থেকে। আমাকে জেলখানাতে ঢুকতে দেয়া হবে। তবে রোগির চিকিৎসার ইতিহাস ছাড়া আর কিছু জানা যাবে না। আমি জেলারকে অনুরোধ করলাম, একটি বাঙ্গালী রেস্তোরাঁ থেকে কোন খাবার আনা যায় কি না। রাশভারি জেলার প্রথমে আপত্তি করলেও পরে রাজি হলেন। আমাকে বললেন কোন আইটেমগুলো কিনতে হবে এবং কোথা থেকে কিনতে হবে। আমি জেলখানাতে পৌঁছানোর পর তারা আমাকে খাবারগুলো দেবে তাঁকে দেবার জন্য।

জেলখানার কড়া নিরাপত্তা পেরিয়ে মমিনা বেগমের সামনা সামনি বসে আছি।

আমি জানি না কীভাবে তিনি এ পর্যন্ত এসেছেন। কেন তিনি খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। আমি মনোরোগ বিশেষজ্ঞ নই। পরিপাকতন্ত্রের বিশেষজ্ঞ হিসেবেও আমাকে ডাকা হয়নি। স্রেফ বাংলাদেশি ডাক্তার হিসেবে ওরা আমাকে ডেকেছে এখানে।

আমি আস্তে ধীরে খাবারগুলো বের করে তাঁর সামনে রাখলাম। বললাম ,

'খান এগুলো। নইলে ওরা ফেলে দেবে সব!'

বাসমতী চালের সরু ভাতের সাথে রূপচাঁদা মাছ ভাঁজা, সবজি, খাসির ভুনা আর ডাল রাখলাম তাঁর সামনে। অনেক বোঝালাম কিছু খাবার জন্য। তিনি কেবলি কেঁদে চলছেন। তিনি আমাকে বলতেও রাজি নন কেন খাবেন না।

ঘণ্টা খানেক বসবার পর আমি বিষণ্ন মনে উঠে দাড়াতেই, তিনি খেতে শুরু করলেন। আমি বসলাম। তিনি আমাকে উনার সাথে খেতে বললেন।

আমি নিমরাজি। কিন্তু তিনি আমার হাতটি ধরে বললেন,

'খাও বাবা। আমার ছেলেটাকে অনেক বলেছি আমার সাথে বসে খেতে। কেবল হেরোইন খাবার জন্য টাকা নিতে আসতো আমার কাছে। আমাকে অত্যাচার করতো। কেমন করে মেরে ফেললাম তাকে।'

এই বলে আবার কান্না শুরু। আধাঘণ্টা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। আমি তাঁর হাত ধরে বসে রইলাম। আবারো তাকে খেতে বললাম। তিনি খেতে শুরু করলেন। আমি তাঁর সঙ্গ দিলাম। তিনি মন ভরে খেলেন।

আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে।

যাবার সময় হলো। মনে হলো এ কারাগারে আরো খানিকটা সময় থাকি।

জর্জ আমাকে খুব ধন্যবাদ জানালো। আমিও তাকে ধন্যবাদ জানালাম।

জেলখানা থেকে বেরিয়েছি। নির্জন রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছি। পথেই বিশাল লেক। লেক তোহোর পাশে শরতের কাশফুসগুলো বাতাসে দুলছে। এই রাতে কাশফুলগুলোর পাশে দাঁড়াতে ইচ্ছে হলো। লেকের পানিতে জ্যোৎস্নার মায়াবি আলো, ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক চারদিকে। কাশবনের পাশে গাড়িটা থামিয়ে খানিকটা দাঁড়ালাম।

মমিনা বেগমের জন্য কষ্ট হচ্ছে।

এরকম মায়াবী রাতের রূপ তিনি হয়তো আর দেখতে পাবেন না।

এমন শরতের রাতগুলো মমিনা বেগমদের বড় দীর্ঘ হয়, হয় বড় একাকী!

'না ডাক্তার, তোমার কথাটা ঠিক নয়।'

জুডিথ ভ্রু কুঁচকে আমার দিকে তাকাল। জুডিথ বরাবরের মত আজও নিজেকে পরিপাটি করে গুছিয়ে নিয়ে এসেছে। মাথা ভরতি সাদা চুলের মাঝে দু'একটা কালো চুল। মাথার ওপর একটা লেসের রঙিন ফিতে। কপালে অনেকগুলো চামড়া কুঁচকে আছে। চোখের নিচেও তাই। পরনে ধবধবে সাদা কড়কড়ে ইস্ত্রি করা জামা আর ঘন নীল রঙের প্যান্ট। তার সাথে শান্তিনিকেতনি ব্যাগটা কোথায় পেয়েছে কে জানে? সাথে তাঁর সব সময়ের সঙ্গী টম।

সব কিছুতেই তাঁর সায় থাকে না প্রথমে। তারপর অনেকক্ষণ বোঝানোর পর তিনি সায় দেন। এই যেমন তাঁর উদ্ভট সব খাবারের রেসিপি। তাঁকে বোঝানো বড় কঠিন যে বয়স বাড়ার সাথে সাথে সব ধরনের খাবার হজম করা সহজ নয়।

জুডিথ এ শহরের প্রথম মহিলা আইনজীবী হয়েছিলেন প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। এ শহরেই তাঁর জন্ম। এখানেই বেড়ে উঠেছেন তিনি। তাঁর পরিবারের কেউ তাকে আইনজীবী হতে সায় দেন নি। তখন পেশাজীবী মহিলারা কেবল সেবিকা পেশাকে প্রধান পেশা হিসেবে বেছে নিতেন। সেবা প্রদান করা ছাড়া তাদের যে অন্য কোন কাজ থাকতে পারে তা ছিল চিন্তার বাইরে। একজন মহিলা আইনজীবী হয়ে কোর্টে একজন পুরুষের সাথে পাল্লা দেবে, এটা ভাবা বড় কঠিন ছিল।

জুডিথ চলে গেলেন নিউ ইয়র্কে। সেখানে আইন পড়ে ফিরে এলেন ফ্লোরিডার ছোট্ট শহর কিসিমিতে। এসেই পারিবারিক আইনে কাজ করা শুরু করলেন। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল অসহায় মানুষগুলোকে সাহায্য করা, যাদের ক্ষমতা নেই আইনজীবীকে পয়সা দেবার। তাই সরকারি আইনজীবী হয়ে তাদের হয়ে লড়তে শুরু করলেন।

এখানে বর্ণবাদের কবলে পড়া এক কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাকে আদালতে সাহায্য করতে গিয়ে তিরিশ বছর আগে কিছু প্রভাবশালী লোকদের ক্ষেপিয়ে তুলেছিলেন তিনি। এমনকি তাঁর নিজের পরিবারও চলে গিয়েছিল তাঁর বিপক্ষে। সব শেষে ফলটা হলো ভয়াবহ। তাঁর বাড়িতে এক রাতে অজ্ঞাত কারণে আগুন লেগে গেল। আগুনে পুড়ে হাসপাতালে থাকতে হলো তাঁর টানা পাঁচটি মাস!

ফিরে এসে মানসিক ভারসাম্য প্রায় হারিয়ে ফেললেন তিনি। এ সময় তাঁর সাথি হলো একটি কুকুর, জেব। এদেশে তাকে বলা হয় 'সার্ভিস ডগ' বা ' কাজের কুকুর'। এরা শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধী মানুষদের সাহায্য করে। এই কুকুরগুলোকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এরা তাদের প্রতিরক্ষা ছাড়াও তাদের বিভিন্ন কাজে, যাতায়াতে, ঘরের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করে। এমনকি

বিপদের সময়য় পুলিশকেও ডেকে দিতে পারে। এদেশের একটি বিশেষ সংস্থা তাদের দেখভাল করে, প্রশিক্ষণ দেয়, তাদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে।

জেবের পর মানি, মানির পর হাল, হালের পর টম এসেছে জুডিথের জীবনে।

এরা জুডিথের পরম বন্ধু। জুডিথকে ওরা বোঝে, জুডিথ ওদের বোঝে।

জুডিথ এখন ঘরহারা মানুষদের অধিকারের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের হয়ে কাজ করে। এ অবসর জীবনে কাজের পর জুডিথের অবসরের সঙ্গী হলো টম।

জুডিথ বলছিল,

'ডাক্তার, আমরা মূলত একা। আমার একলা সময়ে আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি। আমার পাশে টম থাকে। টমও ভাবে হয়ত সেও বড় একা!'

ঘরে ফিরছিলাম গাড়ি চালিয়ে। সন্ধ্যে নামছে অরলান্ডোর আকাশে। হেমন্তের সন্ধ্যে। আমারও হঠাৎ বড় একা লাগা শুরু হলো। কে যেন কানের কাছে বিড়বিড় করতে লাগল,

মানুষ মূলত একা!

যেতে-যেতে

মেঘলা দিন আজ।

গতকাল সারা রাত গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়েছে। সকালের সূর্য না দেখলে দিনটা বিষণ্নভাবে শুরু হয়। বিষণ্ন মন নিয়ে কাজ শুরু করেছি। যদিও সরকারি ছুটির দিন আজ। তবে এ ছুটির দিনেও আমাকে কাজে আসতে হয়েছে।

হাসপাতালের সিঁড়ি বেয়ে তিন তালায় উঠে ডান দিকে প্রার্থনা ঘর। পাশেই দর্শনার্থীদের বিশ্রাম নেবার জায়গা। তার পাশে ছোট দরজা। ওখানে ঢুকলেই মনটা বিষণ্ন হয়ে যায়। খুব গুরুতর অসুস্থ রোগিগুলো এখানে। তিন নাম্বার কামরাতে আছেন আমার দীর্ঘ দিনের পরিচিত রোগি 'টম'।

তার সাথে পরিচয়ের প্রথম দিনই আমাকে নাম ধরে ডাকতে বলেছিল টম। আমার চাইতে পঞ্চাশ বছরেরও বেশি বয়স্ক এ ভদ্রলোককে প্রথম প্রথম নাম ধরে ডাকতে বেশ কষ্ট হত। তবে টম ছিল একরোখা। ওর সারা জীবনই এরকম। বড় একরোখা। দীর্ঘদিন ধরে ও যুদ্ধ করছে মরণ-ব্যাধি এক রোগ নিয়ে। দু'সপ্তাহ আগে অফিসে এসেছিল সে। খুব দুর্বল ছিল। আকস্মিক আমার হাত ধরে বলল,

'ডাক্তার, আমাকে খুব শিগগিরই যেতে হবে। আর বেশিদিন বেঁচে থাকার ইচ্ছে নেই। আমি শান্তিতে মরতে চাই। আজকাল খুব কষ্ট হয়। আমার ছেলেকে আসতে বলেছি শিগগিরই।'

বেশ অসুস্থ হয়ে গেল সে তার দু'দিন পরই।

হাসপাতাল তার ভীষণ অপছন্দের জায়গা। না চাইলেও আসতে হলো তাকে। দিন দিন তার অবনতি হতে থাকলো। গতকাল আমাকে সে আবারো প্রশ্ন করল,

'ছেলেকে আসতে বলবো?'

আমি মাথা নুইয়ে বললাম,

'শিগগিরই।'

ওর ছেলে রিচার্ড গতকাল রাতে এলো ওহাইও অঙ্গরাজ্যের ক্লিভল্যান্ড নামের এক শহর থেকে। পেশায় একজন বিজ্ঞানী। আমার মতই বয়স। এর আগে একবার দেখা হলেও ফোনে কথা হয়েছে বেশ ক'বার। প্রতিবারই আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে তার বাবাকে নিয়ে। টম ক্লিভল্যান্ডে যেতে চায় না। তার ছেলেকে বিরক্ত করবার কোন ইচ্ছে তার নেই।

গত রাতেই টমের পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। ওর হুঁশ নেই কাল রাত থেকে। ওর শেষ ইচ্ছে হিসেবে ওকে কোন শ্বাসযন্ত্রে লাগানো হয়নি। ওর জীবন বাঁচানোর জন্য জটিল কোন চিকিৎসাও তাকে দিতে নিষেধ করে গিয়েছে সে।

রিচার্ড এসে তার বাবার সাথে কথা বলতে পারেনি। টমের বিছানার পাঁশে বসে সে তার হাত ধরে আছে। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ালো সে। আমাকে বিষণ্ন ভাবে বলে উঠলো,

'অনেক করেছ আমার বাবার জন্য। কতক্ষণ আছে টম আমাদের সাথে?'

আমি হালকা ভাবে বললাম,

'বিধাতা জানেন। তবে তা দীর্ঘ হবে বলে মনে হয় না।'

রিচার্ড এর চোখে পানি এসে গেলো। আমার ও।

টম জন্মেছিল ওহাইওর টিফিন নামের এক ছোট্ট শহরে। হাইস্কুল শেষ করে টিফিনের এক কাঁচের ফ্যাক্টরিতে কাজ নিল সে। ১৯৭০ এ তার টিফিন ছেড়ে যেতে হলো। টিফিনের কাঁচের ফ্যাক্টরি চিরতরে বন্ধ হবার পর ভীষণ কষ্টে দিন কেটেছে তার। তার স্ত্রী ও ছেড়ে গেল তাকে। একমাত্র ছেলে রিচার্ডকে নিয়ে সে চলে এলো অরলান্ডোতে। ডিজনীওয়ার্ল্ড-এ কাজ নিয়ে কাটিয়ে দিল সারাটা জীবন।

টমের শখ ছিল বই পড়ার, আর গান শোনার। নীল ডায়মন্ড ছিল তার প্রিয় গায়ক। আমাকে দুটি চমৎকার বই উপহার দিয়েছিল সে। হাসপাতালের পাঠাগারে বইগুলো আছে এখন। রোগিরা পড়েন।

রিচার্ড বলল,

'আমার বাবা তোমাদের হাসপাতালের পাঠাগারের জন্য তার সবগুলো বই আর নগদ কিছু টাকা রেখে গেছেন।' রিচার্ডকে জরুরি কাজে আজই জার্মানিতে যেতে হবে। বাবাকে সে শেষ দেখা দেখে যাচ্ছে। খুব অস্বাভাবিক স্বাভাবিক ব্যাপার। আজ দেখা হলো এক প্রিয়জনের সাথে। আমি জানি আর জীবিত দেখবে না তাকে এর পরের বার। হয়তো বা দেখা হবেই না।

সারা হাসপাতাল ঘুরে ঘরে ফেরার পথে, টমের রুমে আবার দাঁড়ালাম। রিচার্ড তার বাবার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে। আমাকে ধরা গলায় বলল,

'কিছুক্ষণ আগে বাবা তার শেষ শ্বাসটি ছাড়লেন। খুব শান্তির সাথে চলে গেলেন তিনি।'

আমি টমের দিকে তাকালাম। দেখলাম, ম্লান এক হাসি তার মুখে। টম কখনোই কষ্টের মাঝে থেকে জীবনকে দীর্ঘ করতে চাননি। ও প্রায়ই বলতো,

'জীবনের শেষ ক'টা দিন কষ্টের মাঝে না কাটিয়ে, শেষ চিকিৎসার খরচগুলো শিশুদের লেখাপড়ার জন্য খরচ করা উচিৎ।'

অনেক খরচ করে কৃত্তিমভাবে জীবনকে দীর্ঘ করার পক্ষপাতিত্ব টম কখনোই করত না।

হাসপাতাল থেকে বেরোতেই দেখলাম রোদ উঠেছে। গাড়িতে উঠে বাসার দিকে যাচ্ছি। সূর্যের আলো আমার মুখে পড়ছে। নীল ডায়মন্ডের গান চলছে রেডিওতে–

“Sunshine on my shoulders makes me happy
Sunshine in my eyes can make me cry
Sunshine on the water looks so lovely
Sunshine almost always makes me high.”

বব আর মেরিনার গল্প

বয়স নব্বইয়ের বেশী, রোগাটে। মুখটা শুকিয়ে দীর্ণ, কাপড় চোপড়ের অবস্থা আরও করুণ। রোগিটি আমার অনেক দিনের চেনা। আমাকে প্রথম দিনই বলে দিয়েছিল 'মিস্টার মিলার' বলে ডাকবে না আমাকে। 'বব' নামে ডাকবে। এদেশে সবাই প্রথম নামে ডাকাটা পছন্দ করে।

বব এসেছে আমার সাথে দেখা করতে। সে এবার কোন সময়সূচী মেনে আমার অফিসে আসেনি। অফিসের সবাই ওকে চেনে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক অসম সাহসী যোদ্ধা সে। তাঁর গুণগাথা অনেকটা কিংবদন্তীর মতো। একটিই সন্তান তাঁর। থাকে সিয়াটলে। বছরে একবার বাবাকে দেখতে আসে সে।

ববের স্ত্রী অনেক আগেই তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছে অন্য জগতে। নিকটের বন্ধুরাও কেউ বেঁচে নেই।

ববের ওজন কমছে। খুব দুর্বল সে এখন। ওকে জিজ্ঞেস করতে করতে বুঝলাম এখন ওর বাজারে যাবার ক্ষমতা নেই। রান্না করার ক্ষমতা নেই। বেচারা স্রেফ না খেতে খেতে শুকিয়ে যাচ্ছে। বয়স্ক এ মানুষটার সামাজিক সমস্যা আমাকে খুব বিপদের মাঝে ফেলে দিলো। এ রোগের প্রতিকার কীভাবে করা যায় এ নিয়ে ভাবতে ভাবতেই আমার আরেক রোগির কথা মনে পড়লো। তাঁর নাম মেরিনা। মেরিনা লিথুয়ানিয়া বলে একটি দেশ থেকে অধিবাসী হিসেবে এখানে এসেছিল। অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে সে এখন আমাদের শহরের 'বয়স্ক মানুষের সেবা বিষয়ক বিভাগের'(Council of Aging) প্রধান। তাঁকে ফোন দিতেই সে এসে হাজির।

আমি অভিভূত।

ববের মতো মানুষের জন্য এ শহরের সমাজ কল্যাণ বিভাগ তাঁদের বাড়িতে দিনে দুবেলা গরম খাবার বিনা খরচে পৌঁছে দিয়ে আসে। এই বিভাগের নাম Meals on Wheels। তারা সপ্তায় একদিন তাঁকে তাঁর পছন্দ মতো দোকানেও নিয়ে যাবে। সবই বিনে খরচাতে।

ববের মুখে প্রশান্তির হাসি।

তাঁর হাসি মাখা মুখটা দেখে আমার দিনটি আলোয় ভোরে গেল।

মেরিনাকে বললাম, 'তোমরা এত ভালো কাজ করছ। আমার বন্ধুদের তোমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।'

ও হেসে রাজি হয়ে গেল ছবি তুলতে।

এভাবেই ববদের সংকটে হাজির হয়ে যায় মেরিনারা। এভাবেই টিকে থাকে মানুষ। আপনি যদি খুব গভীর ভাবে খেয়াল করেন, তো দেখবেন, মানুষের সবচেয়ে ক্ষতি করে যে, সে মানুষ। আবার মানুষের সবচেয়ে উপকার যে করে, সে-ও মানুষ। অথচ মানুষে মানুষে কী বিস্তর ফারাক!

একটি সহজ মৃত্যু: একটি সহজ জীবন

অধ্যাপক দেশাই সাধারণত দিনের শেষ রোগি হিসেবে আমার অফিসে আসতেন। তাঁর শারীরিক বিষয়গুলোর চেয়ে রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, ইতিহাস নিয়ে তাঁর আলোচনার আগ্রহ থাকতো বেশি। আমিও মনে প্রনে উপভোগ করেছি তা।

প্রায় এক যুগ ধরে তিনি আমার রোগি। বোস্টন থেকে এ শহরে এসেছেন এক যুগ আগে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন তিনি। অরলান্ডোতে এসেছিলেন তিনি অবসর জীবন যাপনের জন্য।

তাঁর ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে। নাতিপুতিও আছে। একমাত্র ছেলে থাকে নিউইয়র্কে। খ্যাতিমান ব্যাংকার সে। মেয়ে আছে শিকাগোতে। বাবার মতো অধ্যাপনা করে সে-ও।

দেশাই সাহেব ফলিত পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক। তাঁর বিষয়ে তিনি একজন দিকপাল বলা চলে। কিন্তু সারা জগতের সব কিছুতেই তাঁর অগাধ জ্ঞান। বাংলাদেশ আর বঙ্গবন্ধুর একজন অন্ধ ভক্ত তিনি। ১৯৭১ এ হার্ভার্ডে বাংলাদেশের পক্ষে তার সমর্থন রেখেছিলেন শক্তভাবে। জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে। আমাকে দেখাতে এলে বাংলাদেশ নিয়ে নিয়মিত আধাঘণ্টা আলাপ করতেন আমার সাথে। প্রতিবারই ঘুরে ফিরে বঙ্গবন্ধুর গল্প তাঁর। আমার দেশ ও জাতির জনককে নিয়ে তাঁর এ মুগ্ধতা আমি উপভোগ করি সব সময়।

পরিপাকতন্ত্র বিশেষজ্ঞ হিসেবে কেন তিনি আমাকে বেছে নিয়েছিলেন, তা জানি না। সময়ের সাথে সথে ডাক্তার রোগির সূক্ষ্ম বিভেদ রেখাটি মিলিয়ে গিয়েছিল আমাদের। পরস্পর বন্ধু হয়ে উঠেছিলাম যেন আমরা। তিনি অফিসে এলে আমার সারা দিনের ক্লান্তি মুছে যেত। আমি গভীর আগ্রহে তাঁর কথা শুনতাম। অনেকটা আমার বাবার ছায়া যেন পেতাম আমি তাঁর মাঝে।

অধ্যাপক দেশাইয়ের বয়স পঁচাশি পেরিয়েছে কয়েক মাস আগে। এ বছরটা খুব খারাপ যাচ্ছিল তাঁর। কয়েকবার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। হৃৎপিণ্ডে অস্ত্রপ্রচারও হয়েছে। প্রতিবারই তাকে দেখতে গিয়েছি। গেলেই মহা আনন্দে নিজের শারীরিক যাতনার কথা ভুলে হড়বড় করে গল্পজুড়ে দিতেন আমার সাথে। অনেক কথা বলতেন একসাথে। বারবারই আক্ষেপ করে বলতেন, 'বাংলাদেশে আর যাওয়া হলো না!'

এবার হ্যারিকেন ম্যাথিউ এসে যখন ফ্লোরিডাতে আঘাত হানল, তখন তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন আবার। জরুরি অবস্থা চারদিকে। এর ভেতরও তাঁর ছেলেমেয়ে এসে ঘুরে গিয়েছে দু'দিন আগে। সকালে হাসপাতালে যাবার

পরেই মিসেস দেশাই খবর পাঠালেন যে দেশাই সাহেব আমাকে খুব দেখতে চান। আজ কাজের খুব চাপ। তার মাঝেও তাকে দেখতে গেলাম।

তিনি আমাকে তাঁর পাশে বসতে বললেন। বসলাম। উনি বললেন,

'ডাক্তার, এ জন্মে আর তোমার দেশে যাওয়া হলো না। অনেক করলে আমার জন্য। আমার সহজ সরল জীবন। এ জীবনটা কত সহজে পার করে দিলাম।'

অধ্যাপক দেশাইয়ের কথা শুনে আমার গলা ধরে এলো। আমি তাঁর হাতে হাত রাখলাম।

তিনি হেসে বললেন,

'আমি আনুকে বলেছি আমকে যেন সহজ সরল ভাবে যেতে দেয়া হয়। আমার যাবার সময় হয়ে এসেছে।'

আমি যখন তাঁকে ছেড়ে এলাম তখন আমি জেনে গিয়েছি যে, এ আসাধারণ মানুষটি ঠিক করে ফেলেছেন তিনি আর আমাদের সাথে থাকবেন না। তিনি মৃত্যুকে খুব সহজভাবে জড়িয়ে ধরেছেন। সহজভাবে খুব কঠিন একটি কাজ করে ফেলবেন তিনি!

ঘরে ফেরার পথে মিসেস দেশাই জানালেন অধ্যাপক দেশাই আর নেই!

আসলে আমরা সবাই মনে মনে প্রস্তুত ছিলাম এটার জন্য। অধ্যাপক দেশাই নিজেই খুব সহজ করে দিয়েছিলেন সবকিছু।

কিছু কিছু অসাধারণ মানুষ জীবনের জটিলতাকে সহজ করে নেন। হঠাৎ আমার কেন যেন কিছুটা হিংসে হতে লাগল অধ্যাপক দেশাইকে। আরো বিশেষভাবে বললে তাঁর সরলতাকে। তাঁর মতো এমন একটি জীবন যদি আমি পাই! তাঁর মতো এমন একটি সহজ সরল জীবন!

তাঁর মতো সহজ সরলভাবে আমিও যেতে চাই।

মার্ক টোয়েনের দু'টো লাইন কাঁচের চুড়ির মতো কানে বাজে–

'The fear of death follows from fear of life.

A man who lives fully is prepared to die at any time.'

-Mark Twain.

মরিস সাহেবের দিনকাল

আমাদের বাসায় আসতে হলে মূল ফটকে দেখা হবে মিস্টার মরিসের সাথে। মূল ফটকের পাশেই ছোট্ট সাজানো গোছানো গার্ড রুম। সেখানেই সপ্তায় পাঁচদিন তাকে দেখি। প্রথম দেখাতেই তিনি আমাকে বলেছিলেন তাকে তাঁর প্রথম নাম ডাকতে। এটা এদেশের রীতি। প্রায় আশি বছরের এ মানুষটিকে প্রথম নামে ডাকতে প্রথম প্রথম বেশ কষ্ট হতো। আস্তে আস্তে তা সয়ে গিয়েছে।

মরিস সাহেবের সাথে প্রতি সপ্তায় কয়েকবার দেখা হয়। দেখা হলেই তিনি হাত তুলে সম্ভাষণ জানান। উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন। হাতে তাড়া না থাকলে আমি থেমে যাই সেখানে। তাঁর সাথে এটাসেটা নিয়ে কথাবার্তা হয়। গত এক যুগে তিনি আমাদের পরিবারের একজন হয়ে গিয়েছেন।

আমরা একটি ছোট দ্বীপের মতো জায়গাতে থাকি। চারদিকে পানি। কেবল পনেরোটি পরিবার এখানে। আমাদের প্রত্যেকের হাঁড়ির খবর তাঁর জানা। এমনকি আমাদের সন্তানদের গানের শিক্ষক, আরবি পড়ানোর মৌলভী সাহেব সবার সাথে তাঁর পরিচয় হয়ে গিয়েছে। দারুন মিশুক মানুষ তিনি।

মরিসের জন্ম এই শহরেই। কয়েক হাজার মানুষের শহর তাঁর চোখের সামনে কয়েক লক্ষ মানুষের শহর হয়ে গেলো। এদেশের মিলাটারিতে কাজ করেছেন কয়েক যুগ। ভিয়েতনাম যুদ্ধের পরপরই অবসরে গেলেন তিনি। যুদ্ধের স্মৃতির কথা বলতে চান না তেমন। এরপর ডিজনিতে কাজ করেছেন তিনি অনেক বছর। সেটি শেষ করে এখানে কাজ করছেন গত দু'যুগ। এটি তাঁর অবসর সময় কাটানোর মোক্ষম পথ।

আজকাল দেখি সপ্তায় সাত দিনই মরিস কাজ করছেন। মরিসের বাড়িতে কেউ নেই। ছেলে থাকে আলাস্কাতে, আর মেয়ে ধারে কাছেই কোথাও। মাঝে মাঝে নাতিদের সাথে সময় কাটান তিনি। মরিস জানালেন এক বাড়িতে থাকতে ভালো লাগে না তাঁর। তাঁর স্ত্রী অনেকদিন রোগে ভুগে মারা গেলেন গত বছর। 'গার্ড হাউসটি' বর্তমানে তাঁর পৃথিবী। সেখানে টেলিভিশন দেখেন, কম্পিউটারে ফেসবুক করেন, কফি খান। এ এলাকার টহল পুলিশরা সময় পেলেই মরিসের সাথে আড্ডা মারতে আসেন। একসাথে কফি খান।

মরিসকে বলেছিলাম একটি কুকুর পালন করবার জন্য। ও পশুপাখি ভালোবাসে। সে জানালো, মারা যাবার আগে তাঁর স্ত্রী মনের মতো করে ঘরের অনেক কাজ করিয়েছিলেন, নতুন আসবাবপত্র কিনেছিলেন। তিনি বলে গেছেন কোনো পশুপাখী যেন এ বাড়িতে না আসে। মরিস সে কথা রাখছে।

মরিসের খুব গৎ বাধা জীবন। প্রতিদিন কাজে আসেন তিনি। একই রুটিন। সেদিন খেয়াল করলাম তাঁর বসার টেবিলে তাঁর স্ত্রী– জোহানার ছবি। তাঁর যুবতীকালের ছবি। সে ছবিতে তাঁর হাত ধরে আছে মরিস। জোহানাকে প্রায়ই স্বপ্নে দেখেন তিনি। স্বর্গে গেলে চিরযৌবনা জোহানার সাথে তাঁর দেখা হবে, এ তাঁর বিশ্বাস।

আজ কথা প্রসঙ্গে মরিস বললেন, 'আজকাল স্মৃতি ধরে রাখতে কষ্ট হচ্ছে।'

এ কাজ ছেড়ে চলে যাবেন তিনি। কীভাবে এ কাজ ছেড়ে ঘরে থাকবেন!

আমি খুব আবেগতাড়িত মানুষ। খুব কষ্ট হচ্ছে আমার। মরিস চলে যাবে এ কথা ভাবতেই কষ্ট হচ্ছে। আজকাল অনেক অনাকাঙ্খিত কষ্ট আসছে। পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছি।

কষ্ট কি মানুষের দু:খ বোঝে? ও তো বলে কয়ে আসে না!

ঝরে যাই আমি ঝরাপাতা

অরলান্ডোর রাস্তাজুড়ে জ্যাম। আধা ঘন্টার রাস্তা এক ঘন্টায়ও শেষ হবে বলে মনে হয় না আজ। অথক কাজের খুব তাড়া। ছুটি কাটিয়ে কাজে ফেরার পর একগাদা কাজ জমে থাকে।

রমিজ সাহেবকে হাসপাতালে দেখতে যাব প্রথমে। তারপর অফিস। রমিজ সাহেব একজন অবসরপ্রাপ্ত বাংলাদেশি অধ্যাপক। ক্যানসাস থেকে এ শহরে এসেছেন অবসরে যাবেন বলে। অরলান্ডোর আবহাওয়া তাঁর পছন্দ। ফলিত পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবে এদেশে এসেছিলেন গবেষণা করতে। আর দেশে ফিরে যাওয়া হয়নি তাঁর। প্রবাস জীবনের শুরুতেই তাঁর এক সহকর্মী নেলিকে বিয়ে করে ফেললেন।

দীর্ঘ দশ বছরের বিবাহিত জীবন ভেঙ্গে গেল। কি কারণে ভেঙ্গে গেল জানি না। এদেশে এসব জিজ্ঞেস করতে নেই। এটি নিছক তাঁর নিজের ব্যাপার।

বছর দেড়েক পর রুমানিয়ার এক চমৎকার মহিলা, ইরিনার সাথে তাঁর পরিচয় হলো। দীর্ঘদিন তাঁরা একসাথে আছেন। একটি সন্তান তাদের। সন্তানটি জন্মগতভাবে বধির। এ নিয়ে রমিজ সাহেবের অনেক দুঃখবোধ আছে।

তাঁর স্ত্রী বাংলায় কথা বলতে পারেন না। ভেবেছিলেন তাকে বাংলা শিখিয়ে নেবেন তিনি। কিন্তু হয়নি। ছেলেটিও বাংলা বলতে পারে না।

গত পাঁচ বছর ধরে আমি তাঁকে চিনি। পরিপাকতন্ত্রের বিশেষ কোন সমস্যা নেই তাঁর। তিনি আমার কাছে আসেন নিছক বাংলায় কথা বলার জন্য। আমি তাঁকে বাংলায় লেখা বই, বাংলা গানের সিডি ধার দিই। তিনি আমাকে মজার মজার সব ভ্রমণ কাহিনি বলেন। তবে অবাক ব্যাপার দেশ ছাড়বার পর আর দেশে ফিরে যান নি তিনি কখনোই।

একজন মানুষ এত বাংলা শুনতে পছন্দ করেন, অথচ তাঁর জীবনসঙ্গিনী বাংলা জানেন না। আর বাংলাদেশে যাবার কথাও ভাবেন না তিনি। মানুষের জীবন বড় বিচিত্র!

দু'মাস আগে রমিজ সাহেব আমাকে বললেন এই ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশে যাবার ইচ্ছে আছে তাঁর। আমি তাঁকে একগাদা উপদেশ দিয়ে দিলাম। আর তাঁর জন্য একটি কবিতা আবৃতির সিডি দিয়ে দিলাম। খুব খুশি হলেন তিনি। বললেন, শুনে ফেরত দেবেন।

গত পরশুদিন তাঁকে বাড়ির উঠোনে হঠাৎ অচেতন অবস্থায় পেল ইরিনা। দ্রুত হাসপাতালে আনলে দেখা গেল মাথায় রক্তক্ষরণ হয়েছে তাঁর। অবস্থার অবনতি হচ্ছে ক্রমাগত।

অচেতন, নিথর রমিজ সাহেবকে দেখে মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল। তাঁর মাথার কাছে আমার দেয়া সেই কবিতার আবৃত্তিটা বাজছে দেখে অবাক

হলাম। ইরিনা সেটা বুঝতে পেরে বলল, এই সিডিটা তিনি দিনরাত মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতেন।

বলা যায় অনেকটা যন্ত্রপাতি দিয়ে রমিজ সাহেবকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। আমি আলতো করে তাঁর হাত ধরলাম। কবিতা বাজছে সিডিতে। সাথে সিতারের মায়াজাল। আমার মনে হলো আমাকে দেখে রমিজ সাহেব ম্লান হাসলেন খানিকটা।

মহাদেব সাহার 'ঝরে যাই আমি ঝরাপাতা' বাজছে তখন...

"তুমি থাকো নক্ষত্র খচিত রাত্রি, শুভ্র মেঘ
উজ্জ্বল সকাল
থাকো বৃক্ষ, থাকো বন, থাকো শিশু ও
কিশোর
থাকো মাতৃ স্নেহ, থাকো অপার করুণা
থাকো প্রেম,
থাকো নিবিড় চুম্বন
ঝরে যাই আমি ঝরাপাতা।"

ডেভিডের সহজ জীবন

ডেভিড সাহেব আজ খুব চমৎকার একটি টাই পরেছেন। ময়ূরের পালকের আদলে সিল্কের কাজ তাতে। হালকা ধূসর রঙের শার্টের ওপর খুব ফুটে উঠেছে তা। ওপরে ময়ূরকণ্ঠি রঙের স্যুট। গাঢ় খয়েরি রঙের ডিজাইনার জুতা। বরাবরের মতেই নিখুঁতভাবে মাথা শেভ করা। তিনি সব সময়ই বাহারি সব কাপড় পরে আসেন। এক কাপড় দুবার পরতে দেখিনি তাকে।

দীর্ঘদিন ধরে চিনি ডেভিড সাহেবকে। তিনি একজন হাইস্কুলের শিক্ষক। ইতিহাস পড়ান। কথা বলতে পছন্দ করেন খুব। আমাদের আইডিয়াল স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক জমির স্যার ছিলেন সম্পূর্ণ উল্টো। তিনি কথা বলতেন খুব কম। সবসময়ই টেট্রনের সাদা পাঞ্জাবি পরতেন তিনি। ক্লাসে তিনি চেয়ারে হেলান দিয়ে পান চিবুতে চিবুতে আমাদের পালা করে ইতিহাসের বই পড়াতেন জোরে জোরে। মাঝে মাঝে বলতেন,

'ইতিহাস শুদ্ধ করে পড়তে শেখো।'

ডেভিড সাহেব আমেরিকার ভবিষ্যত নিয়ে বড়ো চিন্তিত। ইতিহাসের নানা উদাহরণ টেনে আনেন। আমি প্রায়ই তাকে হেসে মনে করিয়ে দেই আমার অফিসে 'রাজনৈতিক আলাপ নিষিদ্ধ।'

তিনি বাড়ি ঘর কেনেননি। গত তিরিশ বছর 'মটর হোমে' থাকেন। সেটি 'মটর হোম পার্কে' থাকে। তাতে বেশ বড়ো একটি শোবার ঘর, রান্না করার ব্যাবস্থা, টয়লেট, বাথরুম সবই আছে। লম্বা ছুটি পেলে তিনি এই মটর হোম চালিয়ে চলে যান মজার মজার সব ছুটি কাটানোর জায়গায়। জনমানবহীন সমুদ্রসৈকতে রাতে বসে গিটার বাজান, কিংবা বনের মাঝখানে রাত বিরেতে মৃদু আলোয় বই পড়েন। পাবলিক লাইব্রেরিতে বিনে পয়সায় বই নেন তিনি। এবারের গরমের ছুটিতে তিনি কয়েক হাজার মাইল গাড়ি চালাবেন বলে ঠিক করে রেখেছেন। বাইরে থেকে দেখে তার জীবনটা স্বপ্নের মতো মনে হয়।

একদিন কথায় কথায় বলছিলেন অরলান্ডোতে আর না। এখান তিনি থেকে চলে যাবেন আলাস্কাতে। গভীর বনে ঝর্ণার পাশে ক'দিন থাকার তার ইচ্ছে। গ্লেসিয়ার দেখবেন তিনি এবার। রাতের আকাশে আরোরা দেখবার দীর্ঘ দিনের শখ হয়তো এবার পূর্ণ হবে তাঁর।

সাইকেল কিংবা জনপরিবহনে চড়ে তিনি যাতায়াতের কাজ চালান। তাঁর স্ত্রী একটি চার্চে কাজ করেন। জীবনযাপনের খরচ তাদের খুব সীমিত। শিক্ষকতাকে বেছে নেবার আসল কারণ ছিল, এ পেশাতে অনেক ছুটি পাওয়া যায়। সে ছুটিতে তিনি তাঁর শখগুলো মেটান। বাংলাদেশের হাইস্কুল শিক্ষকদের কথা মনে পড়ে আমার। তাঁরাও ছুটি পান বটে, কখনো কোথাও সেভাবে ঘুরতে যাওয়ার মতো সামর্থ তাদের হয় না কখনোই। আমাদের শিক্ষক মানেই একটা

আটপৌড়ে টানাটানির সংসার। যেখানো কোনোরকমে বছর পেরোনাই বড় কথা! আমার শিক্ষকদের কথা মনে পড়ে মন খারাপ হয় আমার!

আমি অবাক চোখে ডেভিডকে দেখি। তাঁর নতুন নতুন বাহারি পোষাক-আশাকের দামি শখ আমাকে খানিকটা উৎসুক করে। একদিন তাকে প্রশ্নটা করেই বসলাম। ডেভিড সাহেব হেসে বল্লেন,

'আমার স্ত্রী চার্চের পুরোনো কাপড়ের দোকানে কাজ করে। ওটার নাম 'থ্রিফ্‌ট শপ'। মানুষজনের দান করা পুরোনো কাপড়গুলো পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে খুব কম দামে বিক্রি করা হয় সেখানে। আমি সেখান থেকে পছন্দসই পোষাক কিনে নেই। ব্যাবহার করে আবার ওখানেই দান করে দেই।'

বেশ সহজ ব্যাপার। ওর সহজ জীবনের অন্যান্য সব সহজ ব্যাপারের মতোই।

জীবনটা ডেভিডের মতো সহজ হলে ভালোই হতো।

যাবো বৈশাখে

এদেশে গ্রীষ্মকাল এলো এলো বলে।

কথা নেই, বার্তা নেই আজ বিকেলে আকাশজুড়ে কালো মেঘ এসে হাজির। দমকা বাতাস এসে যোগ হলো তারসাথে। আমার অফিসের রোগি দেখা শেষ করে হাসপাতালের দিকে যাচ্ছি। আকাশে কালো মেঘ আর তার সাথে ঠান্ডা দমকা হাওয়া মুহূর্তের মাঝে নিয়ে গেলো আমার ছোটবেলায়। মনে হলো বৈশাখের শুরুতে স্কুল থেকে বাড়িতে ফিরবার পথে আছি। এখনই কাল বোশেখি ঝড় শুরু হবে। এখনই বাড়ি ফিরতে হবে...!

অরলান্ডোতে কাল বোশেখি ঝড় সদরাচর হয় না। আর কাজের চাপে আমারও বাড়ি ফিরতে মন চাইলেও সহজে যাওয়া হয় না। অনেকগুলো রোগি হাসপাতালে অপেক্ষায় রয়েছে আজ। প্রথম রোগির নাম দেখে চমকে উঠলাম। আমার এক বন্ধুর নামে নাম।

ওর তো এখানে থাকার কথা নয়। তবে আমার বন্ধুর সাথে এই ভদ্রলোকের বয়সে বিস্তর তফাৎ। সত্তর বছরের দীর্ণ শীর্ণ এক ভদ্রলোক বিছানাতে শুয়ে আছেন। আধবোজা চোখ। বিছানার পাশের টেবিলে দুপুরের না খাওয়া খাবার। অবশ্য এসব অখাদ্য একজন বাঙ্গালীর পক্ষে খাওয়া বড়ই কঠিন।

আমি বাংলায় কথা বলতেই তিনি চমকে উঠলেন। মনে হলো প্রাণ ফিরে পেলেন। উনি দেশ ছেড়েছিলেন প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। বছর তিনেক ছিলেন গ্রিসে। এরপর সমুদ্রগামী মাছ ধরার জাহাজে চেপে বসলেন। একযুগ কাটিয়ে দিলেন সমুদ্রের মায়ায়। কখনোই ভাবেন নি ফিরে যাবেন দেশে। ভূমধ্যসাগরের গভীর নীল পানির সাথে সখ্য হয়ে গেলো তার। সখ্যতা হলো গাংচিলের সাথে, নীল আকাশের সাথে।

স্যান্তোরিনি নামে অপূর্ব সুন্দর এক দ্বীপে এসে মতিভ্রম হয়ে গেলো তাঁর। অলিম্পিয়া নামে এক উচ্ছল গ্রিক তরুণি তাঁর মন কেড়ে নিল। সব ছেড়ে তাঁর সাথে থাকতে চাইলেন তিনি সেই দ্বীপে। ভূমধ্যসাগরের গভীর নীল জলের ভেতর থেকে গজিয়ে ওঠা এ পাহাড়ী দ্বীপের গা বেয়ে সাদা আর নীল রঙের সব বাড়িঘর যেন স্বর্গের আরেক রুপ।

দু'বছর কেটে গেলো সে স্বর্গে। এই স্বর্গেও যে দুঃখ-বেদনা থাতে পারে ভাবতে পারেন নি তিনি। এক তীব্র জোছনার রাতে অকস্মাৎ অলিম্পিয়া তাঁকে ছেড়ে গেল। অথচ এর দু'দিন আগেও দু'জনে মিলে একসাথে ছুঁয়ে দেখেছিলেন জোছনার আলো। হঠাৎ মস্তিষ্কে নাকি একটি শিরা ছিঁড়ে গিয়েছিল অলিম্পিয়ার।

এরপর থেকে জোছনা ভরা রাত ভয় পান তিনি।

দেশে ফিরে যেতে যেতে যাওয়া হলো না কখনোই আর। মা বাবা বেঁচে নেই। ভাই বোনেরা কে কোথায়, খবর নেই তার।

সারা দুনিয়া ঘুরে এসে কিউবাতে পৌঁছালেন তিনি দশ বছর আগে। এরই মধ্যে জীবনের ছন্দ বদলে গেছে তাঁর। মদাসক্তিতে তাঁর লিভারে দুরারোগ্য রোগ হয়েছে। ছোট এক ডিঙ্গিতে করে পৌঁছালেন মায়ামিতে আরও কিছু মানুষের সাথে। রাজনৈতিক আশ্রয় পেলেন তিনি।

হাইতির এক পরিবারের কৃপাতে কিছুদিন ছিলেন মায়ামিতে। কিন্তু স্বপ্নের ঘোরে কেবল বাংলাদেশের কথা, তাঁর শৈশবের কথা ভেসে ওঠা শুরু হলো তার। ঘুমের ঘোরে কেবল কাল বোশেখের কথা বলেন তিনি। আম কুড়োনোর কথা বলেন। মুষলধারে বৃষ্টির কথা বলেন। কার কাছ থেকে শুনেছেন অরলান্ডোতে প্রচুর বাংলাদেশি থাকেন। গ্রে হাউন্ডের বাসে করে যখন অরলান্ডো পৌঁছালেন, তখন তিনি একেবারেই গভীর ঘোরের মাঝে।

প্রাথমিক চিকিৎসার পর এখন খানিকটা ঘোর ফিরে পেয়েছেন তিনি।

আমার হাতটা ধরে বললেন,

'এই বোশেখে দেশে ফিরতে চাই।'

কচি সবুজ ধানের খেতে বাতাসের উদোম নাচন দেখার তার খুব ইচ্ছে। ইচ্ছে তার মুচিপাড়ায় গিয়ে মেঘলা রাতে বাউলের একতারার সাথে এক হয়ে যাওয়া। ইচ্ছে তার দমকা হওয়ার মাঝে জীবনটাকে আবার খুঁজে পাওয়া।

কাজ শেষ হয়ে গেলো আজ। হাসপাতাল ছেড়ে ঘরে ফেরার পথে কাল বোশেখের মতো ঝড়। দূরে কোথাও বাজ পড়ল। আকাশজুড়ে নামছে অন্ধকার। আমারও খুব দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। এ বৈশাখে রমনার বটমূলে গান শুনতে চাই। রাস্তার পাশে বসে পান্তা খেতে চাই। শত মানুষের ভিড়ে পুরনো বন্ধুকে হঠাৎ ফিরে পেতে চাই।

অন্ধকার নামছে হাইওয়েতে। রবিঠাকুরের গান বাজছে। গানটাকে কেমন যেন অচেনা মনে হলো...

"যে পথ দিয়ে যেতে ছিলাম
ভুলিয়ে দিল তারে,
আবার কোথা চলতে হবে
গভীর অন্ধকারে।

বুঝি বা এই বজ্ররবে
নতুন পথের বার্তা কবে,
কোন পুরিতে গিয়ে তবে
প্রভাত হবে রাতি।"

মায়ের আঁচল

বারবারা খানিকটা ভ্রু কুচকে তাকালো আমার দিকে। সেই তাকানোতে কোনো ভাষা নেই, প্রশ্ন নেই..! আছে কেবল সারল্য।

পরিচিত এক ডাক্তার বন্ধু বারবারাকে পাঠিয়েছে আমার কাছে। ওর বয়স আশির কাছাকাছি। স্মৃতিভংশতে (Dementia) ভুগছেন তিনি। আরো অনেক জটিল রোগ আছে তার। আজকাল খেতে চান না। ওজন কমছে । আমার কাছে পাঠানো হয়েছে পাকস্থলিতে একটি কৃত্তিম খাদ্য নালী বসানোর জন্য। বারবারা আজকাল খুব একটা কথা বলেন না।

ওর তিন ছেলে মেয়ে। একজন ডেনভারে, একজন আটলান্টা আর একজন থাকে মায়ামিতে। সবাই যে যার মত আছে। গত ক্রিসমাসের ছুটিতে তার এক মেয়ে এসেছিল নাতিসহ। বারবারা মাঝে মধ্যে তার নাতির কথা বলে আর কাঁদে।

ওর বড় ছেলের সাথে অনেক কথা হলো ফোনে। ও চায় মা আরো দীর্ঘ দিন বেচে থাকুক। আমি খানিকটা ইতস্তত করতে করতে কথা শেষ করলাম।

বারবারাকে জিগ্যেস করলাম, কী চাও তুমি?

সে প্রশ্নটি এড়িয়ে আমাকে আমার মায়ের কথা জিজ্ঞেস করলো। আমি আবারো একই প্রশ্নে ফিরে গেলাম। সে আমাকে বললো,

'তুমি আমার মাকে জিজ্ঞেস করো। আমার মা সব জানেন।'

বারবারার ছেলেই তার Power of attorney বা তার হয়ে সিদ্ধান্ত দেবার মালিক। বারবারার ছেলের কথাই শুনতে হলো।

বারবারার কথা ভাবতে ভাবতে মনটা কেমন যেন হয়ে এলো। বাইরে অনেক মেঘ। বৃষ্টি হবে শিগগিরই। আমার মাকে বড় দেখতে ইচ্ছে করছে। ইচ্ছে করছে আবার শিশু হয়ে মায়ের আঁচলের তলে লুকিয়ে বৃষ্টি দেখি.....!

একটি পরিপূর্ণ জীবন

প্রতিদিনের মতো আজও একটি স্বাভাবিক দিন। সকাল সকাল কাজে বেরিয়েছি। চেনা রাস্তা, অচেনা মুখ। সবাই সবার মতো চলছে।

অফিসে প্রথম রোগিটা পুরো পরিবার নিয়ে এসেছে। ভদ্রলোকের বয়স ৮০ ছুঁই ছুঁই। অন্ত্রনালিতে কান্সার। আমাকে পুরো পরিবারের সামনে এ দুঃসংবাদ দিতে হবে। দুঃখের খবর দেয়া খুব একটা সুখকর কাজ নয়। অথচ এই অপ্রিয় কাজটা প্রতিদিন করতে হয় আমাকে।

প্রিয়জনদের সাথে দুঃসংবাদ ভাগাভাগি করলে তার বোঝা কি কমে যাবে? অনেক গবেষণা করে মনস্তত্ত্ববিদরা দেখেছেন– কমে। আমার বাক্তিগত অভিজ্ঞতা ও তাই।

এ ভদ্রলোক খবরটা খুব সহজভাবে নিলেন। তাঁর মেয়ের চোখে জল। ৫৬ বছরের দাম্পত্য জীবনের সাথী, বন্ধু তাঁর জীবনসঙ্গিনী তাঁর হাত ধরে অশ্রুসিক্ত হয়ে তাকিয়ে আছেন। তিনি বললেন,

'আমার জীবনে কোন কিছু অপূর্ণ নেই, ডাক্তার। আমি শান্তিতে কষ্টহীন ভাবে বাকি ক'টা দিন কাটাতে চাই।'

'আমার জীবন পূর্ণ।' এটি একটি অপূর্ব অনুভুতি। এ অনুভুতির সাথে বোধ করি মরণও হার মানে।

"অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো
সেই তো তোমার আলো।
সকল দ্বন্দ্ব- বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো
সেই তো তোমার ভালো।"
-রবিঠাকুর

গতকাল সারা দিন বৃষ্টি ছিল। মুষলধারে বৃষ্টি। খুব প্রতীক্ষিত এ বৃষ্টি।

আজ ঝকঝকে রোদেলা দিন। মেঘহীন আকাশ।

বছরের এ সময়টা বড় চমৎকার। শীতের শেষ। ঝরা পাতার বেলা শেষ।

নতুন কুঁড়ি, নতুন কলি, নতুন রঙ-বেরঙের ফুল। বাতাসে পরাগের তীব্র ঘ্রাণ। মন আকুল হয়ে যাওয়া মাতাল সে ঘ্রাণ। কিন্তু আমার বড় কঠিন সময় এটি। সুখের অসুখ। আমার এ শরীর এ মাতাল পরাগ সহ্য করতে পারে না। অ্যালার্জিতে বড় কষ্টে থাকি।

গতদিনের আকাশ ভাঙ্গা বৃষ্টি সে সব পরাগ ধুয়ে মুছে নিয়ে গেলো। অনেক দিন পর আজ আবার দীঘির পাড়ে বসলাম। সূর্যাস্তের ঠিক আগে আগে।

মনটা আজ খুব বিষণ্ন থাকার কথা। কিন্তু আমি মোটেই বিষণ্ন নই। বরং একটা শূন্য অজানা আবহে মনটা ভরে আছে।

আমার গত ন'ছরের খুব পরিচিত রোগি আজ একটি নতুন যকৃত পাবার জন্য হাসপাতালে এসেছে। ওর অবস্থা ভালো নয়। আজ ভোর সকালে সব কাজ শুরু করার আগে ওর সাথে কথা বলতে গেলাম। ও তলিয়ে আছে গভীর ঘোরের মাঝে। মাঝে মধ্যে ফিরে আসছে বাস্তবতায়। ওর খুব কাছের দু'জন মানুষ– স্বামী আর মেয়ে ওর পাশে। আমাকে দেখে চিনতে পারলো সে। আমি তার হলুদ শীর্ণ হাতখানি ধরতেই সে বলে উঠল,

'ডাক্তার, তুমি বড় ভালো মানুষ। এ জনমে দেখা না হলেও, আমি নিশ্চিত, স্বর্গে তোমার সাথে দেখা হবে।'

আমার চোখে পানি চলে এলো। গলাটা ধরে এলো। কিছু বলতে চাইলাম। কিন্তু বলা হলো না।

হালকা শীতের মৃদু বাতাসে দীঘির পাড়ে সূর্যাস্ত দেখতে দেখতেই খবর পেলাম, আমার রোগি খানিক্ষণের মধ্যেই যাবে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত অস্ত্রপ্রচারে।

সূর্য ডুবে গেলো এরইমধ্যে। আকাশ এক অদ্ভুত লালে রাঙানো এখন। আমি এই গোপন নির্জনতাতে বলি–

'জীবন বড় সুন্দর!'

মধুর আমার মায়ের হাসি

আজ সারাদিন হাসপাতালে কাটিয়েছি।

শেষে সবাই 'মা দিবসের' প্রস্তুতি নিচ্ছে সবাই। আর আমি সারাটা দিন কাটালাম হাসপাতালে। সবকিছু কি আর ইচ্ছেমত হয়?

'জরুরি বিভাগ' থেকে ডাক এসেছে। দিনের শুরুটা বড় জটিল। তেইশ বছরের এক যুবকের রক্তবমি হচ্ছে। তার মা তাকে নিয়ে এসেছে জোর জবরদস্তি করে।

ছেলেটির রক্তচাপ কমে যাচ্ছে, প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে। সাথে সাথে ঝাঁপিয়ে পড়তে হলো। ঘন্টা খানেক কঠিন পরিশ্রম করে রক্তপাত বন্ধ করা গেলো। ওর মাকে খবরটি জানালাম। তাঁর চোখে মুখে খানিকটা স্বস্তির ছাপ ফিরে এলো।

সারা দিনের সব জরুরি চিকিৎসা সেবা দিয়ে ঘরে ফেরার আগে ছেলেটিকে আবার দেখতে গেলাম আমি। ছেলেটি আগের চাইতে ভালো এখন। তবে বিপদ পুরো কাটেনি। মা তার মাথার কাছে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

ছেলেটি বাবা হারিয়েছে অল্প বয়সে। মায়ের কাছে তাঁর বেড়ে ওঠা। মা কঠিন পরিশ্রম করে একাই তিন সন্তানকে বড় করেছেন। এই ছেলেটি ছোটবেলা থেকে ভুগছে কঠিন মানসিক সমস্যায়। তা থেকেই মাদকাসক্তি। অনেক কষ্ট করেও ফেরাতে পারেন নি ছেলেটিকে।

জীবনের শুরুতেই জীবনের শেষভাগে ছেলেটি। মা সেটি আঁচ করতে পারছেন। গভীর মমতা দিয়ে আগলে রাখতে চাইছেন তাঁর ছেলেকে। আমাকে অশ্রুসিক্ত চোখে তিনি বললেন,

'ডাক্তার, আমার লিভারের অর্ধেকটা ওকে দিলে কি ও বেঁচে যাবে?'

মা জাতটা এমনই। পৃথিবীর সব মা তাঁর সন্তানদের গভীরভাবে ভালবাসেন, সব বিপদ থেকে আগলে রাখতে চান। এই নারীও তার ব্যতিক্রম নয়।

গাড়িতে করে বাসার দিকে যাচ্ছি। আমার প্রিয় গানটি শুনছি আবার...

"মা কে মনে পড়ে আমার, মা কে মনে পড়ে...!"

দেয়ালের মাছি

নাসিমা বানু চুপ করে বসে আছে। তার চোখ বেয়ে পানি পড়ছে। গোলাপী রঙের ওড়না দিয়ে তার মাথা ঢাকা। ওড়নার পাশ দিয়ে সোনালি চুমকির কাজ।

বরাবরের মতোই নাসিমা খুব হালকা একটা আতর মেখেছে। রজনীগন্ধার মতো লাগে খানিকটা। কখনো তাকে জিজ্ঞেস করিনি আসলে গন্ধটা কি রজনিগন্ধার? রোগিকে এসব কথা জিজ্ঞেস করতে নেই।

আমি নাসিমাকে একটি ন্যাপকিন এগিয়ে দিলাম। বললাম,

'কেঁদো না।'

তবুও তার চোখের পানি থামছে না।

নাসিমা ঢাকার মেয়ে। গেন্ডারিয়ার রহমত মিয়ার ছয়টি সন্তানের সবচে সুন্দরী এবং বুদ্ধিমতী নাসিমা কলেজ শেষ করতে পারেনি।

পাড়ার বখাটে ছেলেরা তার পিছনে লেগে গিয়েছিল। মজলু ব্যাপারির বখাটে ছেলে তার সাথে বিয়ের প্রস্তাবও দিয়েছিল। তাতে রহমত মিয়া রাজি হননি।

নাসিমার মুখে এসিড ছোঁড়ার চিঠি হাতে পাবার পরই নাসিমাকে হবিগঞ্জের নাদির সর্দারের বাড়িতে পাঠানো হলো। নাদির সর্দার তার বড় মামা। ছোট খাটো ঠিকাদারী আর ম্যানপাওয়ারের রমরমা ব্যাবসা তার।

হবিগঞ্জে এসে বড়ো শান্তি পেলো নাসিমা।

দু'মাসের মাথায় নাদির সর্দারের বন্ধুর ছেলে ফরিদ এলো ফ্লোরিডা থেকে। ফরিদের চোখে মুখে মার্কিন মার্কিন ভাব। ওর দুটো গ্যাস ষ্টেশন আর একটা ষ্টোর আছে। দেশে এসেছে বিয়ে করতে।

নাসিমাকে এক নজর দেখেই ফরিদের পছন্দ হয়ে গেলো। লম্বা চওড়া হ্যান্ডসাম ফরিদের পছন্দ নাসিমার সব কিছুই। নাসিমা গান গাইতে পছন্দ করে, ছবি তোলার খুব শখ। কবিতা লেখা আর আবৃত্তির প্রতি তার দুর্বলতা। ফরিদের ওগুলোতে ঝোঁক নেই। তবে সাফ সাফ জানিয়ে দিলো,

'নাসিমার পছন্দই তার পছন্দ।'

দু'সপ্তার মধ্যেই বিয়ে হয়ে গেল নাসিমা আর ফরিদের। নাসিমার মা ফুল্লোরা বেগমের আপত্তি ছিল কিছুটা। তিনি চেয়েছিলেন মেয়েটি পড়াশুনা শেষ করে একজন অধ্যাপক হবে। সে আপত্তি ধোপে টেকেনি। দু'মাসের মাথায় ফ্লোরিডাতে এসে পড়লো নাসিমা। দেখা গেলো ফরিদের সব কিছুই মিথ্যে। ও আসলে রাতের শিফটে দারোয়ানের কাজ করে। দিনে সময় পেলে উবারের গাড়ি চালায়।

আস্তে আস্তে বেরোলো সে সিটিজেন হবার জন্য এক পোর্টোরিকান মহিলাকে বিয়ে করেছিল। সে ঘরে একটি ছেলেও আছে। বিবাহ বিচ্ছেদ হলেও তার সাথে সম্পর্ক আছে।

বিয়ের তিন মাসের মাথায় জন্ডিস নিয়ে নাসিমা আমার কাছে এসেছিল চিকিৎসার জন্য। আজ জানা গেল তার হেপাটাইটিস বি হয়েছে। ফরিদের হেপাটাইটিস বি রোগের ইতিহাসটি পুরোনো কাগজপত্র ঘেটে বের করেছে সে।

আমি হতবাক। এ রোগটা তো প্রতিকার করা যেতো।

আমি কখনো কখনো অদ্ভুত সব ঘটনার সামনে পড়ে যাই।

জানিনা কি ভাবে নাসিমাকে সান্তনা দেবো!

কখনো কখনো নিজেকে দেয়ালের মাছি বলে মনে হয়। সব দেখতে পাই। শুনতে পাই। আর ভনভন শব্দ করতে পাই। অথচ...!

রোজমেরির আলোকিত জীবন

রোজমেরিকে সবাই সংক্ষেপ করে ডাকে রোজ। বড় কোন নামকে ছোট বানিয়ে ডাকা এখানকার রীতি।

রোজ তার বয়সি মা বাবাকে আমার কাছে নিয়ে এসেছিল তাঁদের সাস্থ্যসেবার জন্য প্রায় পনের বছর আগে। ওর বাবা মা কথা বলতে পারেন না। তারা ইশারার ভাষা বা 'sign language ব্যাবহার করেন। রোজ কথা বলতে পারে আবার ইশারার ভাষাও বোঝে। সে এসেছিল তার বাবা মাকে সাহায্য করতে।

ওর বাবা মার জন্ম নিউইয়র্কে। ওর বাবা ড্যানিয়েলের এক বছর বয়সে মেনিনজাইটিস হবার পর সে কানে শোনার আর কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। আর তার মা জন্মগ্রহণের সময় জটিলতার জন্য জন্মগতভাবে মুক এবং বধির। দুজনকেই সে সময় একটা বিশেষ স্কুলের ভর্তি করা হলো। সে থেকেই দু'জন দু'জনকে চেনে। তাঁরা দুজনেই ইশারার মাধ্যমে নিজেদের প্রকাশ করতে শিখেছেন। সেই বিশেষ স্কুলে পড়তে পড়তেই তার মা জেনেলিয়া সেলাই কর্মে পারদর্শী আর বাবা ড্যানিয়েল খুব ভালো ঘড়ি মেরামতের বিশেষজ্ঞ হয়ে গেল।

ড্যানিয়েল আর জেনেলিয়া একে অন্যকে খুব ছোটবেলা থেকে চেনে। একে অন্যকে সব সময়ই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সব সময়। আর তাই সাতাশ বছর বয়সে তাঁরা একসাথে ঘর বাধলো। বিয়ের দু'বছর পরই জেনেলিয়ার কোলজুড়ে আসলো রোজমেরি।

রোজমেরি কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ শিশু হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছিল। তবে ছোটবেলা থেকে রোজ শিখে নিয়েছে ইশারার ভাষা। বাবা মার সাথে বড়ো হয়ে ওঠা রোজমেরি স্বাস্থ্য পরিচর্যাতে স্নাতোকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে বাবা মাসহ চলে এসেছিল অরল্যান্ডোতে। কাজ নিয়েছিলো ডিজনি ওয়ার্ল্ডে।

সেখানে সবাই জেনে ফেললো সে ইশারার ভাষা ভালো বোঝে। সে হয়ে গেল ডিজনির ইশারার ভাষার বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষক। খুব তাড়াতাড়ি রোজ বুঝে গেল যে এ বিষয়ে ভালো শিক্ষকের অভাব রয়েছে। সে ইশারার ভাষা শেখানোর জন্য একটু প্রতিষ্ঠান খুলতে চাইলো। দু'জন বিত্তবান মানুষ তাঁকে এ ব্যাপারে সাহায্য করলো।

সে স্কুলের জন্য সবচে খুশী হয়েছে ড্যানিয়েল আর জেনেলিয়া। ভাষা শহিদদের বছর ১৯৫২ সাল থেকে দু'জন দু'জনকে চেনে তাঁরা। রোজের প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হতে পেরে মহা আনন্দে দিন কাটে তাঁদের।

মুখ আর বধির বাবা মা'র সন্তান হয়ে রোজ খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করেছে ইশারার ভাষা শেখার মূল্য। আর সে শিক্ষার আলোতে রোজমেরি আলোকিত করছে মুখ আর বধিরদের অন্ধকার ভুবন।

স্মৃতিভ্রংশ

ভিক্টর যখন কথা শুরু করে, তা চলতেই থাকে। অনেকটা লক্ষহীন ভাবে। মিশেল তখন স্নেহভরা কণ্ঠে ভিক্টরকে থামতে বলে।

আজকাল কোনো প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেয় না ভিক্টর। এই যেমন তাকে জিজ্ঞেস করলাম,

'গত সাতদিন ঘুম কেমন হয়েছে?'

ভিক্টর বললো, 'ঘুম তো খুব দরকার। ঘুমালে ভালো লাগে। ছোটবেলায় মা আদর করে ঘুম পড়িয়ে দিতেন।'

তখন মিশেল বললো, 'ডাক্তার, ওর ঘুম ভালো হচ্ছে।'

ভিক্টর আর মিশেলকে আমি গত পনেরো বছর ধরে চিনি। ভিক্টরের বয়স এখন আশি ছুঁই ছুঁই। মিশেলের পঁয়ষট্টি। মিশেল কিছুদিন আগে তাঁর চাকরি থেকে অবসরে চলে গিয়েছেন। ভিক্টর অবসরে গিয়েছেন বছর দশেক আগে।

অসম বয়সী এ দম্পতি আমার খুব প্রিয়। ভিক্টর কৃষ্ণাঙ্গ। জর্জিয়ার এক ফার্মে তাঁর জন্ম। বাবা ছিল একজন দাস। অল্প লেখাপড়া করে সেনাবাহিনীতে নাম লেখালো সে। ভিক্টর ভিয়েতনামের যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে কানেটিকাটের একটি ছোট্ট শহরের এক কারখানাতে প্রকৌশলী হিসেবে কাজ শুরু করলো। সেনাবাহিনীতে থাকাকালীন সময়েই সে লেখাপড়া করে একজন প্রকৌশলী হয়ে যায়। একদিন সেই শহরের একটি পাবে তাঁর সাথে পরিচয় হয় মিশেলের সাথে।

মিশেল শেতাঙ্গ। নিউইয়র্ক এর আলবেনি শহরে তাঁর জন্ম। সৎ বাবার লোলুপ দৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্য বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে কানেটিকাট অঙ্গরাজ্যের ছোট এক শহরে পাবে কাজ নিয়েছিল সে। ভিক্টর তাঁকে স্কুলে যাবার জন্য উৎসাহিত করতো। অবশেষে রাজি হয়ে গেল সে একদিন। ততদিনে মন দেয়া নেয়া শুরু হয়েছে তাঁদের। কলেজ শেষ করার পরপরই মিশেল তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিলো। নতুন জীবন শুরু হলো এ যুগলের।

মিশেল বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ডি পেরিয়ে অধ্যাপনা শুরু করলো। তাদের একমাত্র সন্তান গ্রেগ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা শেষ করে সেখানেই অধ্যাপনা করছে এখন। সুখী এ দম্পতি অরল্যান্ডোতে এসেছে দু'দশক আগে।

বই পড়তে আর ভ্রমণে তাঁদের মহা উৎসাহ। গত এক বছর হলো ভিক্টরের স্মৃতিশক্তি লোপ পাচ্ছে। কিন্তু সে একজন বুদ্ধিমান মানুষ হিসেবে সেটা লুকোবার চেষ্টাও করছে। সব ভুলে যাওয়া প্রশ্নগুলো সে 'গল্পকরণ' করে ফেলে। সে মানতে রাজি নয় যে তাঁর স্মৃতিভ্রংশ রোগ হয়েছে।

আমি একজন প্রিয় বুদ্ধিমান মানুষের স্মৃতিভ্রংশ দেখছি। ভিক্টর আস্তে আস্তে অনেক কিছু ভুলে যাবে। অনেক আপন জনকে চিনতে পারবে না। ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে যায়।

প্রতিদিন ভোরে বাসা থেকে কাজে আসার পথে আমার বাবার সাথে কথা হয়। তিনিও ভুলে যাচ্ছেন অনেক কিছু। তা থেকে হতাশা জন্ম নিচ্ছে তাঁর আর আশেপাশের সবার। স্মৃতিভংশের ওষুধ শুরু করেছেন তিনি। সে ওষুধ সহ্য করতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর।

কাজ শেষে সূর্যাস্তের মুখে মুখে ঘরে ফিরছি আমি। চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। আস্তে আস্তে আমিও স্মৃতিভ্রংশের দিকে যাবো হয়তো একদিন!

আজকের সূর্যাস্তটা আরো গভীরভাবে উপভোগ করতে ইচ্ছে হচ্ছে হঠাৎ আমার!

বৃত্তের বাইরের জীবন

বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি। বৃষ্টির ভাব গতি দেখে মনে হয়, আজ সারাদিন ঝরবে সে।

এই কিছুদিন আগে ছুটি কাটিয়ে ফিরেছি। ছুটির আমেজ এখনো যায়নি। এরকম বৃষ্টিমুখর দিনে ঘর থেকে বেরোতে ইচ্ছে হয় না। পানির ধারে বসে জলপতনের ছন্দ শুনতে ইচ্ছে হয়। ঝুমুর ঝুম শব্দ শুনতে শুনতে গরম ধোঁয়া ওঠা কফির কাপে চুমুক দিতে ইচ্ছে হয়।

অথচ আমার সে উপায় নেই। আজ সবগুলো রোগি এসে হাজির। আমার প্রথম রোগির রুমে ঢুকতেই সে দাঁড়িয়ে পড়লো। দাঁড়াতে গিয়ে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলেন তিনি। হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিলাম। খারাপ আবহাওয়ার মাঝে অফিসে আসবার জন্য ধন্যবাদ জানালেন তিনি আমাকে। আমার মেঘলা দিন সাথে সাথে রোদেলা হয়ে গেল।

রোগির নাম উইলিয়াম। সবাই তাঁকে 'বিল' নাম ডাকে। বিল লিভারের কিছু সমস্যা সমাধানের জন্য আমার কাছে এসেছেন। অনেকটা গল্পের মতো করে তাঁর রোগের ইতিহাস বলেন বিল।

বছর খানেক আগে বিল ছিলো নিউইয়র্কের একটি নামকরা সংস্থার বড়োকর্তা। দিনরাত পাগলের মতো কাজ করেছেন। ক্ষমতা আর অর্থের বলয়ে খানিকটা বৃত্তবন্দি অবস্থায় ঘুরছিল তাঁর জীবন। তাঁর মা মারা যায় যখন তিনি হাইস্কুলে পড়েন। বাবাই তাঁকে বুকে আগলে ধরে বড়ো করেছেন। কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া শেষ করে ওয়াল স্ট্রিটের বড়ো চাকরিতে ঢুকবার পরপরই তার বাবা অরলান্ডোতে চলে আসলেন অবসর যাপনের জন্য। বছরে দু'বার বিল তাঁর বাবাকে দেখতে আসতেন। এপ্রিলে তাঁর বাবার জন্মদিনে আর নভেম্বরে থ্যাংক্স গিভিং এর ছুটিতে।

বছর খানিক আগে বিল খবর পেলেন বাবা প্রায় মরণাপন্ন। বাবাকে দেখতে হাসপাতালে ছুটে এলেন তিনি। হাসপাতালে বাবার বিছানার পাশেই তাঁর তীব্র খিঁচুনি শুরু হলো হঠাৎ। তাঁকেও হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। ব্রেনে টিউমার ধরা পড়লো তাঁর। বিলের সাথে সাথে একই হাসপাতালে ভর্তি হতে হলো। বড়ো ধরনের একটি অস্ত্রপ্রচারের পর তাঁর জীবন বদলে গেল। বাবা মারা গেলেন তিনি হাসপাতালে ভর্তি থাকা অবস্থায়ই। অপারেশনের পর তিনি তাঁর শারীরিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেন। কথা বলতে এখনো খানিকটা কষ্ট হয়। স্মৃতির চিলেকোঠা প্রায়ই গোলমেলে হয়ে যায় তাঁর।

বাধ্য হয়ে চাকরিতে ইস্তফা দিতে হয় তাকে। বন্ধুরা যে যার মতো ব্যস্ত। কাউকে জীবন সঙ্গী করার মতো সময় আর খুঁজে বের করা যায়নি। এখন একটি দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসাকেন্দ্রে থাকতে হয় তাকে। সার্বক্ষণিক দেখাশোনার

ভালো বন্দোবস্ত আছে। টাকা পয়সা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই তার। বিশাল অংকের টাকা সঞ্চিত রয়েছে ব্যাংকে। সেসব খরচ হচ্ছে তাঁর চিকিৎসা সেবার জন্য।

বিল খুব দুঃখ করে বললো একটি বড়ো ছুটি নেবার ইচ্ছে ছিল। আমাজনের জলপ্রপাতের ওপর পাখির মতো গ্লাইডিং করবার শখ ছিল। প্যাটাগোনিয়াতে হারিয়ে যাবার প্রচণ্ড ইচ্ছেটাকে দমিয়ে রেখেছিলেন তিনি বছরের পর বছর। অথচ তা আর বোধহয় হলো না!

বিলের মুখের দিকে তাকিয়ে আমাদের ভঙ্গুর জীবনের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি।

বিলের সাথে আরো খানিকটা সময় কাটাবার ইচ্ছে ছিল। আরেকদিন হবে সেটা।

আমি জানালা দিয়ে বাইরের বৃষ্টির দিকে তাকালাম। খুব বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছে হলো। আজ কাজ শেষে ঘরে ফিরে বৃষ্টিতে নেমে পড়বো। আমার এসব পাগলামি আমার স্ত্রী সিলভীর সয়ে গেছে। এইতো সেদিন আইসল্যান্ডের জলপ্রপাতের একটি নড়বড়ে পাথরের উপরে দাঁড়িয়েছিলাম বলে সিলভী কী বকাই না দিয়েছিল সেদিন।

অথচ আজ এ ছবিটার দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে জীবনটা এসব পাগলামিতে ভরা থাকলে মন্দ হয় না। বিল যাবার আগে সেই কথাটা বলে গিয়েছিল আমাকে।

সীমাবদ্ধ জীবনের অসীম ভালোবাসা

আজ সবার তাড়াহুড়ো।

হ্যারিকেন 'ড্যারিয়েন' ধেয়ে আসছে অরলান্ডোর দিকে। তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেরিয়ে যাবার তাড়া সবার।

এরই মাঝে কিছু রোগিরও তাড়া আছে তাড়াতাড়ি ডাক্তার দেখাবার।

আজ জোসেফ তার বাবা মার সাথে এসেছে। এ পুরো পরিবারটি আমার খুব কাছের। গত পনেরো বছর ধরে আমি ওদের চিনি।

জোসেফের বয়স এখন বত্রিশ। জোসেফ জন্মেছিল শারীরিক এবং মানসিক প্রতিবন্ধী হিসেবে। ও দেখতে পারে, শুনতে পারে। তবে কথা বলতে পারে না, তার হুইল চেয়ার ছেড়ে বাইরে বেরুতে পারে না। ওর মা জেসেনিয়া পরম আদরে বেড়ে তুলেছে তাকে। জোসেফ তার প্রথম সন্তান। সে জন্মাবার পর থেকেই জীবন বদলে যায় জেসেনিয়ার।

তেইশ বছর বয়সে তার কোলজুড়ে আসে জোসেফ। তখন সে ইউনিভার্সিটি শেষ করে কেবল একটি ব্যাংকে কাজ শুরু করেছে। তার সারা জীবনের শখ বড়ো একজন ব্যাংকার হবার। একজন ল্যাটিন আমেরিকার অধিবাসী হিসেবে তার ভবিষ্যতে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার অভিলাষ আমাদের মতোই। সে স্বপ্নে বাঁধ সাধলো জোসেফ। একজন পুরোপুরি প্রতিবন্ধী সন্তানকে বড়ো করতে যেয়ে তার সারা জীবনের স্বপ্নকে জলাঞ্জলি দিয়ে দিলো সে।

জোসেফ জন্মাবার তিন বছর পরই তার স্বামী তাকে ছেড়ে চলে গেল। তার পরিবার-পরিজন এগিয়ে এলো তার সাহায্যে। কিছু সময় কাজ, কিছু সময় পড়াশুনা আর অধিকাংশ সময়ই তার কাটে জোসেফের সেবা করতে করতে। এদেশে এ ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুদের সেবা কররার জন্য আবাসিক প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু জেসেনিয়া কোনোদিন জোসেফকে সেখানে দেবার চিন্তা করেনি। জোসেফ তার দিকে তাকিয়ে হাসে, মাথা নাড়ে। জেসেনিয়া সব বোঝে। জোসেফের সুখ-দুঃখ, ভালোবাসা-উচ্ছ্বাসের ভাষা আর কেউ বোঝে না জেসেনিয়ার মতো।

বিশাল সংগ্রামের মাঝে জেসেনিয়া আস্তে ধীরে পড়াশুনা করে একজন পাবলিক একাউন্টেন্ট হয়েছে বছর দশেক আগে। নিজেই একটি ছোট একাউন্টিং ফার্ম খুলেছে। এখন তার আধা ডজন কর্মচারী। রাউল এর মধ্যে একজন। প্রায় কুড়ি বছর আগে জেসেনিয়ার ফার্মে কাজে যোগ দেয় সে। সেও একজন একাউন্টেন্ট। দু'জন দু'জনের পাশে থাকে সব সময়।

জোসেফের যত্ন করবার জন্য আর কোনো সন্তান নেয়নি জেসেনিয়া আর রাউল। ওরা দেশ-বিদেশে ঘুরতে যেতে পারে না। চাইলেই পছন্দের

রেস্তোরাঁয় জোসেফকে নিয়ে যেতে পারে না। শপিং মলে কিংবা ছবি দেখতে যাবার আগে চিন্তা করতে হয় তাদের।

বিশ্বভ্রমণের ভীষণ শখ ছিল তাদের। সব সময় আমার ভ্রমণের গল্প শুনতে চায় তারা। জেসেনিয়া আর রাউলের চোখ জ্বলজ্বল করে। আমি বুঝতে পারি তাদের চোখের ভাসা। একটা দুঃখ অনুভব করি তাদের জন্য।

তাদের প্রিয় ঘুরবার জায়গা ডিজনি ওয়ার্ল্ড। তারা জোসেফের মতো প্রতিবন্ধী মানুষগুলোর জন্য চমৎকার ব্যাবস্থা করে রাখে। তাদের পরিবারের জন্য আলাদা ভাবে বিনোদনের ব্যাবস্থা থাকে।

জেসেনিয়ার খুব ইচ্ছে ছিল তার জন্মভূমি পেরুতে যাবে, জোসেফকে নিয়ে মাচুপিচু যাবে। কিন্তু সে জানে এ জীবনে হয়তো সেটা হবে না। জেসেনিয়ার সীমাবদ্ধ জীবনে অসীমের স্বপ্ন কেবল স্বপ্নই থেকে যাবে!

এবারো যাবার আগে জেসেনিয়া জোসেফকে বললো,

'ডাক্তারকে বিদায় বলো।'

জোসেফ তার চিরচেনা মিষ্টি হাসিটা দিলো। আমার মন আনন্দে ভরে উঠলো।

হ্যারিকেনের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে তারা। সব কিছুই জোসেফকে ঘিরে। ওর দু'সপ্তার খাবার-দাবার, ডাইপার, ওষুধ-পত্র, ওর রুমের আলো বাতাসের জন্য জেনারেটর সব প্রস্তুত।

প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্য মা'দের ভালোবাসা একটি সুস্থ সন্তানের চেয়েও গভীর। মা জানে তারা কতো অসহায়। এসব মায়েদের জীবন সীমাবদ্ধ, অথচ তাদের মনটা আকাশের মতো বিশাল। এর পরতে পরতে থাকে অসীম ভালোবাসা।

শুভ নববর্ষ

গত কদিন ধরে বিকেল বেলা অরলান্ডোর আকাশজুড়ে কালো মেঘ নেমে আসে প্রথমে। তারপর আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে। কালবোশেখী ঝড়ের মতো। সে সময়টাতে আমি দীঘির পাশের খোলা উঠোনে বসে থাকি। ঝড় বৃষ্টির

স্পর্শ অনুভব করি। এ সময়টা খুব একটা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। যে কোনো সুখকর স্মৃতির মতোই এ অনুভূতিও ক্ষণস্থায়ী। এর পরপরই মেঘের পাশে ওঠে রোদ। সোনালী ডানার ঝিমকিকে রোদ।

আজ বিকেলেও তার ব্যাতিক্রম হয়নি।

আকাশ ভেঙে পড়া বৃষ্টির ঝাপটা লাগছে আমার চোখেমুখে। এই অসাধারণ ঘোরের মাঝে নরম্যানের কথা ভাবছি।

নরম্যান আজ এসেছিল। ও আমার দীর্ঘদিনের চেনা। একজন বোহেমিয়ান প্রকৃতির শিল্পী মানুষ। চেহারাতেও তার ছাপ আছে। নির্মলেন্দু গুণ বা রবিঠাকুরের মতো লম্বা দাড়ি। জীবনযাত্রা খানিকটা আমাদের নড়াইলের এসএম সুলতানের মতো। একটি বিশাল রাঞ্চে একা থাকে। একগাদা ছাগল আছে তার। ছোট ছোট 'পিগমি ছাগল'। তার বাড়ির চারদিকে ওরা দলবেঁধে ঘুরঘুর করে সব সময়।

ছবি এঁকে জীবন কেটে যায় তার। বছরে একটি মাত্র ছবির প্রদর্শনী করে সে নিউইয়র্কে। সেখানে বিক্রিত ছবির উপার্জনে চলে যায় তার খেয়ালি জীবন। আমি তার মিশ্র মাধ্যমের কিছু কাজ দেখেছি। তার শিল্পীয়ানাতে রীতিমত মুগ্ধ আমি। যদিও ছবির বোদ্ধা আমি নই। তবে তার ছবিগুলো আমার কাছে অসাধারণ লাগে। তার প্রায় সব ছবিতেই একটা গল্প থাকে জীবনের।

নর্থ ডাকোটার ছোট্ট এক শহরে তার জন্ম। নরম্যানের বাবা ছিল মদ্যপ। প্রায়ই তার মা'কে ধরে পেটাতো মাতাল অবস্থায়। ছ'ভাই বোনের বিশাল পরিবার তার মা'কেই টানতে হতো। সন্তানদের মুখে খাবার তুলে দেবার জন্য মা একটি রেস্তোরাঁয় দিনরাত কাজ করতো। সব ক'টি ভাই বোনের ছিল মানবেতর জীবন।

তার বয়স তখন সাত। অনাহার কিংবা অর্ধাহারে কাটে দিন। একরাতে তার মাতাল বাবা ঘরে এসে তার মা'কে না পেয়ে তাদের সবাইকে মারধোর করলো। পরদিন নরম্যান স্কুলে যাবার পর তারশিক্ষক তার মুখে আঘাতের চিহ্ন দেখে জানতে চাইলো কি হয়েছে? সে সব খুলে বলতেই সে শিক্ষক 'শিশু প্রতিরক্ষা বিভাগকে' জানিয়ে দিলো সবকিছু। তারা এসে তাদের বাড়িতে সবকিছু দেখে তার বাবা মাকে সন্তান লালন-পালনের অনুপযুক্ত ঘোষণা করলো। তারা বিভিন্ন পরিবারের কাছে দত্তক দিয়ে দিলো তার সব ক'টি ভাই বোনকে!

নরম্যানকে দত্তক নিলো উইসকনসিনের একটি ছোট শহরের এক নিঃসন্তান দম্পতি। খুব তাড়াতাড়ি সে টের পেয়ে গেল যে, তার দত্তক বাবা মা দুজনেই মাদক ব্যাবসার সাথে জড়িত। আস্তে আস্তে সে-ও জড়িয়ে গেল তাতে। বছর দশেক পর এক গভীর রাতে পুলিশ এসে ঘিরে ফেললো তাদের বাড়ি। বাবা মার সাথে সে-ও গ্রেফতার হলো।

তার নতুন আশ্রয় হলো একটি 'অপ্রাপ্যবয়স্কদের সংশোধন কেন্দ্রে।' এখানে এসে জীবনের মোড় পুরো ঘুরে গেল তার। সংশোধন কেন্দ্রের কঠিন পরিশ্রমের পর সেখানকারই এক শিক্ষকের কাছে তার শিল্পচর্চার হাতেখড়ি। এরপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তার। এ শহরে এসেছে একযুগ আগে। শহরের খানিকটা বাইরে একটা রাঞ্চের মাঝে তার বাড়ি আর ছবি আঁকার ঘর।

অনেক বছর ধরে তার মাকে খুঁজে ফিরছে নরম্যান। এই তো, গত সপ্তায় তার মার খবর পেয়েছে সে। পোর্টল্যান্ডের এক ফার্মে মা থাকে তার মা। আজ সকালে খুব খুশিমনে আমাকে জানিয়ে দিয়ে গেলো সে। আগামী পরশু তার মাকে দেখবে সে দীর্ঘ চার যুগ পর। তার চোখেমুখে ঠিকড়ে পড়ছে একটি স্বর্গীয় হাসি।

কালবোশেখী ঝড়ের বৃষ্টির ঝাঁপটা কমে গিয়েছে এর মাঝে। মেঘের নিচে উঁকি দিচ্ছে রোদেলা সূর্য।

বাংলা নববর্ষের শুরু আজ। বৃষ্টির পর অবাক করা সূর্যের আলোয় মনটা এক অজানা আনন্দে ভরে আছে। নরম্যানের আনন্দে আমার বাংলা নববর্ষের এ শুভ ক্ষণটি আরো আনন্দময় হয়ে গেল।

মাইকেলের সহজ জীবন

মাইকেল খুব সাদাসিধে ধরনের ছেলে। আজ বিকেলেও তার পোষা কাকাতুয়ার গল্প করেছে আমার এক রোগির সাথে। রোগিও তার পোষা বিড়ালের গল্প করেছে। রোগির অসুখের পাশাপাশি তাদের ব্যাক্তিগত ইতিহাস চিকিৎসার জন্য একটি দরকারি অংশ।

রোগির রুমে ঢুকতেই আমার রোগী তার প্রশংসাতে ব্যাস্ত হয়ে পড়ল,

একজন শিক্ষানবিশ ডাক্তার হিসেবে ওর আন্তরিকতায় আমি মুগ্ধ।

মাইকেলের জন্ম ক্যানাডার এন্টিগোনিশ নামের এক ছোট্ট শহরে। বছরে নয়মাস বরফে ঢাকা থাকে সে শহর। এরই মাঝে কঠিন জীবনযাত্রা তাদের।

তার পূর্বপুরুষ এসেছিল স্কটল্যান্ড থেকে। একটা ছোট স্কটিশ গ্রামের বেশ ক'টি পরিবার মিলে গড়ে তুলেছিল এ শহর। গবাদিপশুর লালন পালন করে জীবিকা নির্বাহ করতো পূর্ব-পুরুষ। এখনো সেটাই আছে। শুধু আধুনিকীকরণ হয়েছে কাজটা।

মাইকেলের বাবা একজন পশু চিকিৎসক। তাদের শহরে কোনো চিকিৎসক নেই। সে রেসিডেন্সি ট্রেনিং শেষে ফিরে যাবে তার শহরের সবার চিকিৎসাসেবার দায়িত্ব নিতে।

ফ্লোরিডাতে থাকবার খুব শখ তার। রোদ্রোজ্জল এ শহরের গরম আবহাওয়া তার খুব প্রিয়। তবুও রুক্ষ্ম-শীতল এন্টিগনিশই তার চূড়ান্ত গন্তব্য।

সে বললো, 'আমার শহরের মানুষগুলো খুব শান্তিপ্রিয় আর চিকিৎসক হিসেবে আমি দেবতুল্য সম্মান পাবো। পাশাপাশি আমাদের নিজের গবাদিপশুর ফার্মটাও দেখাশুনা করবো।'

সে কথা বলছে, আর অদ্ভুত একটা আলো যেন নেচে বেড়াচ্ছে তার চোখেমুখে। জীবনের হিসাব-নিকাশ কী সহজ মাইকেলের কাছে। জীবনটাও যেন খুব সহজ তার। সহজ মানুষের সহজ চাওয়া, সহজ লক্ষ্য। মাইকেলকে দেখে আশান্বিত না হয়ে উপায় নেই।

বিজয় দিবস এবং শরাফত সাহেব

বিজয় দিবস এলেই শরাফত সাহেবের স্মৃতিগুলো মনে পড়ে। জীবদ্দশার শেষ বছরগুলোয় তাকে প্রায়ই হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যায় ভর্তি করা হতো।

জীবনের শেষ কিছুদিন খুব কষ্ট হলেও শরাফত সাহেব কৃত্তিম শ্বাস প্রশ্বাসে নিয়ে বাঁচতে চান নি। তখন তার মেজাজটাও খুব খিটমিটে থাকতো। অবশ্য এমনিতেই তিনি বেশ খিটমিটে স্বভাবের মানুষ ছিলেন। প্রথম পরিচয়ে তাকে কেউ বিশেষ পছন্দ করে কিনা, এ ব্যাপারে আমার বেশ সন্দেহ আছে। অবশ্য তাতে তার কিছু আসে যায় নি।

আমার মনে আশা ছিল, তিনি হয়তো এবার ফিরে আসতে পারবেন। অনেকবারই তিনি আমাকে অবাক করে দিয়েছেন। কিন্তু এবার আর পারলেন না।

শরাফত সাহেবের সাথে আমার পরিচয় প্রায় দশ বছর। সময় গড়িয়ে যাবার সাথে সাথে তার অনেক ইতিহাস আমি জেনেছি। বাড়ি তার দাউদকান্দিতে। গ্রামের ধনী পরিবারের মেধাবী ছাত্র হিসেবে কয়েক গ্রামের মানুষজন তাকে চিনতো।

যখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এলেন, তার আশা ছিল আকাশছোঁয়া। রাজনীতির ধার ধারতেন না। বন্ধুবান্ধবরা রাজনীতি করতো। তিনি করতেন পড়াশোনা। এরই মাঝে পরিচয় হলো রাবেয়ার সাথে। প্রথম দেখাতেই রাবেয়ার প্রেমে পড়ে গেলেন তিনি।

রাবেয়া করতেন প্রগতিশীল ছাত্র রাজনীতি। তিনি রাবেয়ার রাজনীতি দর্শনের ছায়াতে থাকতেন। তার বাইরে পা রাখতেন না তিনি। রাবেয়া যখন মিছিল মিটিংএ ব্যস্ত, তখন তিনি পড়াশোনায়।

এরই মাঝে তার একটি সুযোগ এসে গেলো ফলিত রসায়নে উচ্চশিক্ষার। অনেক দূরে। সেই ক্যামব্রিজে। রাবেয়াকে বললেন, চলো বিয়েটা সেরে ফেলি। রাবেয়া রাজি হলেন না। তবে রাবেয়া কথা দিলেন– তিনি অপেক্ষায় থাকবেন।

দু'বছর পর ফিরে এলেন তিনি। রাবেয়া তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে তৃণমূল রাজনীতিতে ঢুকে গেছেন। রাবেয়ার কাছে বিবাহিত জীবন, ঘর বাঁধবার স্বপ্ন, বিলেতে যাবার স্বপ্ন কেবল বাতুলতা।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে ঢুকলেন। শুরু হলো ঊনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান। আস্তে আস্তে তিনিও জড়িয়ে পড়লেন রাজনীতিতে অনিবার্যভাবে। ১৯৭১ এর ২৫ শে মার্চের কালো রাতের বীভৎসতা নিজ চোখে দেখলেন তিনি।

রাবেয়া সে রাতে হারিয়ে গেল তার জীবন থেকে। সে রাতে রাবেয়া ছিলেন আজকের রোকেয়া হলে।

রাবেয়াকে অনেক খুঁজেছেন তিনি। খুঁজতে খুঁজতে জড়িয়ে গেলেন মুক্তিযুদ্ধে। বনে বাদাড়ে দিনের পর দিন রাতের পর রাত কেটেছে তার ।

তার যুদ্ধে যাবার খবরটা জেনে যায় শান্তি বাহিনী। তার বাবা আর দু'ভাইকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। যুদ্ধের মাঝে আহত হয়ে ফিল্ড হাসপাতালে ছিলেন অনেক দিন। প্রায় মরতে মরতে বেঁচে যান তিনি। বিজয় শেষে ফিরে আসেন নিজের গ্রামে। কিছুই ছিলো না তার তখন। ঘর পুড়ে গেছে, আপন আত্মীয় কেউ আর নেই। নেই রাবেয়াও।

আবার ফিরে এলেন তিনি ক্যামব্রিজে। আসক্ত হয়ে গেলেন কাজ আর গবেষণার মাঝে। এরই মাঝে এক মার্কিন বিজ্ঞানীর সাথে পরিচয়। তারই আমন্ত্রণে পারডু বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে এলেন তিনি।

সেখানেই পরিচয় আইরিনের সাথে। বুলগেরিয়ার অধিবাসী এ রমণীর মাঝে তিনি যেন খুঁজে পেলেন রাবেয়ার ছায়া। সময় পেলেই অনেক দূর গাড়ি চালাতেন আইরিনকে নিয়ে। একদিন ভয়াবহ এক সড়ক দুর্ঘটনায় পড়ে গেলেন তিনি। সে যাত্রায় তিনি বেঁচে গেলেও বাঁচলো না আইরিন। তারপর থেকে ভগ্ন স্বাস্থ্য তার। এর ওপর যোগ হলো মাদকাসক্তি।

এ শহরের কোনো বাঙালির সাথে মিশতে চান না তিনি। নিজেকে রাখতে চান অযত্নে অবহেলায়। কেবল শেষের প্রতীক্ষায় নিজেকে সযত্নে দূরে রেখেছেন সবকিছু থেকে। স্মৃতিকে বড়ো ভয় পান তিনি।

বিজয় দিবস এলেই তার মন ভীষণ এলোমেলো হয়ে যেতো। এবার আর তা আর হবে না। নিজের দেহটা তিনি দান করে গিয়েছেন মেডিক্যাল কলেজের গবেষণার জন্য। তাকে কেউ কোনোদিন খুঁজেও পাবে না। হয়তো কেউ খোঁজও নেবে না তার!

শরাফত সাহেবরা এভাবেই হারিয়ে যান। খ্যাতি, যশ, পার্থিব কোন কিছুই স্পর্শ করে না তাদের। কেউ জানতে পারে না তাদের।

আমি, তাকে খুব কাছ থেকে দেখা মানুষ হিসেবে অন্তত এই কথাটা নিশ্চিত জানি– ক্ষয় নেই তার।

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"

নবান্নের সময়

নভেম্বর মাসের দিকে আমরা সবাই থাকতাম দারুণ ব্যাস্ত। বার্ষিক পরিক্ষা। অপেক্ষা শুধু পরিক্ষা শেষের। সদরঘাটে গেয়ে মহা আনন্দে চড়ে বসতাম 'গাজী' লঞ্চে। সরষে রঙের গাজীতে দোতলার কেবিন যেন ছিল এক স্বর্গ। কেবিনের দোতলা বিছানায় কে ওপরে ঘুমোবে তাই নিয়ে চলতো যুদ্ধ। সবগুলো কেবিনের বাইরে খোলা বারান্দা। সাদা রঙের কিছু ইজি চেয়ার পাতা। বাবা মায়ের সাথে বসে, ছোট দু'বোনকে নিয়ে কে ক'টা পাল তোলা নৌকা দেখলো, তার প্রতিযোগিতা।

সূর্যাস্তের সময়টা কেন জানি মনটা আমার বিষণ্ন হয়ে আসতো। কেবিনের ভেতরের দিকে ছিল খাবারের হল। আতপ চালের গরম ভাত, ঝোল ইলিশ, সদ্য ভাজা সবজি আর মুগ ডালের স্বাদটা এখনো জিভে লেগে আছে। লঞ্চ থামত চাঁদপুর, ঝালকাঠি ... হয়ে খুলনায়, রূপসা নদীর তীরে। সেখান থেকে আরেকটা ছোট লঞ্চে উঠে চিত্রা নদীর পাড়ে নড়াইল।

সে সময় ছিল ধান কেটে ঘরে আনার সময়। নবান্নের সময়। নানাবাড়ির চারদিকে তখন উৎসব উৎসব ভাব। বড় বড় খড়ের গাদা। ঢেঁকিতে ধান ভানা হচ্ছে। বাংলো ঘরের উঠোনে দস্তর বিছিয়ে সব মা খালাদের গল্প। সে সময় গ্রামের বাড়িতে কোন বিদ্যুৎ ছিল না। রাতে হ্যাজাক জ্বালিয়ে চলতো 'পালা গানের' পালা।

সকালে খেজুরের রস আসতো। তা জ্বাল দিয়ে তৈরি হতো আতপ চালের 'রসের পায়েস'। ভাজা পিঠা, রুটি পিঠা, পালের হাঁসের মাংশ দিয়ে শুরু হতো দিন। তেষ্টা পেলেই কচি ডাবের ঠান্ডা পানি। সব মামাত-খালাত ভাই বোনদের সাথে দূরন্ত ছুটে বেড়ানো, বিলের দিকে মাছ ধরা, শালুক কুড়ানো, ঘুড়ির সুতোয় পাল্লা...কী সব দিন ই না ছিল!

এ সময় গ্রামে না গেলে মতিঝিল কলোনিতে হালকা ঠান্ডার রাতে আলো জ্বালিয়ে খেলতাম ব্যাডমিন্টন। বিকেলে বাসার সামনের জাম গাছের নিচে দাড়িয়ে সব বন্ধু মিলে তুমুল আড্ডা হতো। আমরা সবাই মিলে বনভোজনের ফন্দি আঁটতাম। আড্ডার মাঝে মাঝে কী চোখ চলে যেত এদিক ওদিক? আমরা মজা করে বলতামঃ ফিল্ডিং।

উঠতি বয়সে মেডিকেল কলেজে এ সময়টাতে বিকেলে 'ক্যাফে রোজে' আড্ডা বসতো। পনেরো বিশ জন বসে সারা দুনিয়ার গল্পসল্প, আর রসালো গসিপগুলো নিয়ে চায়ের কাপে ঝড় উঠত। পরিক্ষা পেছবে কিনা, অটো ভেকেশন হবে কিনা, এ নিয়ে চলতো জল্পনা-কল্পনা। সবারই চোখ কোন না কোনভাবে স্থির হতো রাস্তার ওপাড়ে-- কান্তা ছাত্রিনিবাসের দিকে।

আজ অনেক বছর পরে, আমার নতুন আবাসে এ সময়টা এদেশী নবান্নের।

থ্যাঙ্কস গিভিংয়ের পালা শেষ। পরিবার পরিজনদের সাথে এদেশীয় নবান্ন করে ঘরে ফিরেছি।

আজ বিকেলে এক পশলা বৃষ্টির পর শীতের ছোঁয়া গায়ে লেগেছে দীর্ঘদিন পর। শীতের ছোঁয়া গায়ে লাগতেই হঠাৎ করে ধানের নাড়ার ঘ্রাণ পেলাম যেন!

নড়াইলের পাশ ঘেঁষে চিত্রা নদীর পাড়ে কাঁশবনের কথা মনে পড়ছে। পুরনো ঢাকার অচেনা এক গলিতে রিক্সার পাশ কেটে চলে যাওয়া শীতের বিকেলের কথা মনে পড়ছে। মাধবদীর নবান্নের উৎসবটা বড় মনে পড়ছে।

দীঘির পারে সন্ধ্যা নামছে। হালকা কুয়াশা দীঘির বুকে। হেমন্ত ফুরিয়ে যাচ্ছে!

"হেমন্ত ফুরায়ে গেছে পৃথিবীর ভাঁড়ারের থেকে;
এ রকম অনেক হেমন্ত ফুরায়েছে
সময়ের কুয়াশায়ে।"
–জীবনানন্দ

জীবনের দু:খ কষ্ট

জেফের সাথে খুব চমৎকার সম্পর্ক আমার অফিসের সবার।

জেফ যখনই অফিসে আসে, হাতে থাকে তার ডোনাটের বাক্স আর কিছু চকলেট। মাঝে মধ্যে বিনা কারণেই জেফ অফিসে এসে হাজির হয়। ওয়েটিং রুমে একা বসে থাকে আর অপেক্ষারত রোগিদের সাথে খোশগল্প করে।

বয়স তার সত্তর পেরিয়েছে দু'বছর আগে। মাথাভর্তি ধবধবে সাদা চুল। গত কয়েক বছর ধরে চুল হালকা হয়ে যাচ্ছে তার। তবে তার পাকানো গোঁফের বহর কমেনি। তাতে সে মোম মাখিয়ে খানিকটা সালভাদোর ডালি বানিয়ে রাখে। ওর গালজোড়ার কারণে হাসলে ওকে সব সময়ই দাদু দাদু লাগে।

জেফের জন্ম ওহাইওতে। নেলসন ভিল নামের এক কয়লা খনির কাছাকাছি এক শহরে তার জন্ম। বাবা ছিল কয়লা খনির শ্রমিক। কয়লা খনির শ্রমিকের ছেলে খনিতেই কাজ করবে, এই ছিল নিয়ম। জেফ নিয়মটা ভেঙে স্কুল শেষ করে চলে যায় পিটসবার্গে।

সেখানে এক লাইব্রেরিতে কাজ শুরু করলো। সেই থেকে বই পাগল হয়ে গেল সে।

অনেক বছর পর লাইব্রেরির গণ্ডি পেরিয়ে আবার কলেজে গেল সে। পড়াশুনা শুরু করলো প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে। পরে মেতে উঠল গবেষণায়। মায়ান সভ্যতার ওপর তার অগাধ দখল। দীর্ঘদিন প্রত্নতত্ত্বের কাজে সে ঘুরে বেরিয়েছে মেক্সিকো আর অন্যান্য মধ্য আমেরিকার দেশগুলোতে। সেখানেই লিলিয়ানের সাথে দেখা। কাজ করতে করতে দু'জনের মাঝে গড়ে ওঠে গভীর সখ্যতা। প্রায় তিন যুগ ধরে বিবাহিত এই যুগল ছিল এক অনন্য প্রেমের গল্পের বাস্তবিক নায়ক নায়িকা।

বিয়ের পরপরই দু'জনেই চাকরি ছেড়ে প্রত্নতত্ত্ব গবেষণার খণ্ডকালীন কাজ নিয়ে জীবন কাটিয়েছে। ওদের পূর্ণকালীন কাজ ছিল বই পড়া।

লিলিয়ান গত হয়েছে চার বছর আগে। দুরারোগ্য এক ক্যান্সারে কয়েক বছর যুদ্ধ করে জিততে পারেনি সে। নিঃসন্তান জেফের জীবন কাটে সেই পুরোনো সঙ্গী বইকে নিয়ে। অরুন্ধুতি রায়ের 'দা মিনিস্ট্রি অফ আলটিমেট হ্যাপিনেস' পড়ছে সে এখন। অনেক প্রশ্ন তার এ বইটি নিয়ে। একদিন তাকে নিয়ে বসতে হবে।

জেফ বেশ নাদুসনুদুশ প্রাণময় মানুষ। তার শরীর আর গোঁফের বাহারে ক্রিসমাসের মাসে তার খুব কদর বেড়ে যায়। বিভিন্ন জায়গায় সান্তা ক্লজ হিসেবে কাজ করে সে।

গত কয়েক বছর ধরে সান্তা ক্লজ সেজে আমাদের অফিসে হাজির হয়ে যায় সে না বলে কয়ে। সবার মাঝে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় তখন তার সাথে ছবি তুলবার জন্য।

আজ ও এসেছিলো। আমিও ওর পাশে দাঁড়ালাম। ছবি তুললাম।

জেফ মনে করে, সময় দিলে আমি ভালো পাঠক হতে পারি। আমার খালি সময়ের কমতি। জেফের মতো আমারো বড়ো দুঃখ! কতো ভালো ভালো বইগুলো পড়ে যেতে পারবো না এ ছোট্ট জীবনে। তবে জেফের চেয়ে আমার দুঃখ অনেক বেশি।

নরমার ব্যাগ এবং আমাদের নববর্ষ বরণ

নরমার সাথে সব সময়ই কাঁধে ঝোলানো একটি বড় ব্যাগ থাকে। একেক সময় একেক কিসিমের ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে আসে সে। আমার কাছে সবচে ভালো লাগে শান্তিনিকেতনী কায়দায় করা একটি ব্যাগ। নরমা সেটি কিনেছিল গোয়াতে বেড়াতে গিয়ে।

একা মানুষ সে। সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াবার বাঁধা নেই তার।

ওর ব্যাগ ভরতি থাকে অনেক কিছু। চকলেট, বেলুন, কাপড়ের রুমাল, বাচ্চাদের খেলনা, বিস্কুট আরো অনেক কিছু। একদিন ওকে জিজ্ঞেস করলাম,

'এতো কিছু ব্যাগে রাখো কেনো?'

ও ঠোঁটে মিষ্টি হাসি ফুটিয়ে বললো, 'আমি তো জানি না যে কখন কী কাজে লেগে যায়।'

আমার অফিসের সবাই ওর ভক্ত। যখনই সে আমাদের অফিসে আসে, তখনই সবার জন্য থাকে তার টুকিটাকি উপহার। নিষেধ করলেও শোনে না সে। সবার জন্য অফুরন্ত ভালোবাসা তার।

নরমার বয়স ষাটের কাছাকাছি। সাদা কালো চুল। বয়সের তুলনায় মুখের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে খানিকটা বেশি। ল্যাটিন পূর্বপুরুষদের লাবণ্য তার মুখজুড়ে।

নরমার জন্ম নিউইয়র্কে। বাবা মা ছিলেন কৃষিজীবী। লং আইল্যান্ডের শেষ মাথায় এক ফার্মে তার জন্ম। জন্মের পর তার বাবা তার মাকে ছেড়ে চলে যায়। সে রহস্যটা কখনো জিজ্ঞেস করিনি তাকে। নরমার মা তাকে নিয়ে চলে আসে ব্রঙ্কস নামের এক ঘনবসতি পূর্ণ এলাকায়। সেখানে দারিদ্র আর কষ্টের মাঝে তার বেড়ে ওঠা। সময় পেলেই নরমা চলে যেতো হাসপাতালে। সেখানে সমাজ সেবা বিভাগে স্বেচ্ছায় কাজ করতো ক্যান্সারের রোগিদের জন্য।

নরমার এ অভ্যাসটা হয়েছিল যখন ওর মা'র ক্যান্সার ধরা পড়লো। প্রচণ্ড কষ্ট আর একাকিত্বের মাঝে যখন দু'একজন স্বেচ্ছাসেবক আসতেন তার সাথে সময় কাটাতে কিংবা কোনো সাহায্য নিয়ে, তখন তাদের মনটা আনন্দে ভরে উঠতো। মনে হতো আবার সুস্থ হয়ে উঠেছেন তারা। মা মারা যাবার পর থেকে ক্যান্সার রোগিদের সেচ্ছাসেবক হবার প্রচেষ্টা তার সব সময়।

অবসর নেবার পর অরলান্ডোতে চলে আসলেন তিনি। বিয়ে থা আর করা হয়নি সময় করে। সুযোগ পেলেই 'গিভ কিডস দি ওয়ার্ল্ড' নামের এক দাতব্য প্রতিষ্ঠানে তিনি সময় দেন।

এ প্রতিষ্ঠানের বড়ো একটি রিসোর্ট আছে অরলান্ডোতে। খানিকটা ডিজনি ওয়ার্ল্ডের আদলে। সেখানে বেড়াতে আসা শিশু এবং তাদের পরিবারের

জন্য তার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকেই বের হয় অনেক উপহার। সারা দুনিয়া থেকে ক্যান্সার আক্রান্ত শিশুরা তাদের পরিবার নিয়ে আসে এখানে। থাকা খাওয়া আর ডিজনি ওয়ার্ল্ডে তাদের ঘুরে বেড়ানোর সব দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানের।

কঠিন কষ্টের মাঝেও শিশু রোগিসহ পুরো পরিবারের সবার মাঝে আনন্দের হিল্লোল এনে দেয় এখানে কাটানো সময়টা।

এবারের নববর্ষের প্রথমদিন নরমার সাথে আমরাও সেখানে যাবো। ক্যান্সার আক্রান্ত শিশু আর তার পরিবারদের খাবার দাবার আর সেবা দানের জন্য সেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করবো। আমাদের কাঁধে থাকবে নরমার মতো উপহার ভরা বড় ব্যাগ। নরমা আসলে একটা ভাইরাসের মতো। সে যেখানে যায়, সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ে।

অরলান্ডোর চিঠিঃ মধুর আমার মায়ের হাসি

অরলান্ডোর রাস্তায় ট্রাফিক বাড়ছে আজকাল। অফিসে যাবার আধাঘন্টার রাস্তা প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেগে যায়।

ট্রাফিকে আটকে থাকা সময়টা খানিকটা সাপেবর হয় আমার জন্য। আমি প্রতিদিন সকালে গাড়িতে করে কাজে যাবার পথে মা বাবার সাথে কথা বলতে বলতে যাই। এটা আমার অনেক দিনের অভ্যাস। আমার সুখ-দুঃখ, নিত্যদিনের বাধা-বিপত্তির গল্প করি। মায়ের প্রতি আমার পক্ষপাতিত্ব আছে। কোনো না কোনো ভাবে তাঁর সাথেই কথা বেশি হয়।

যেদিন সকালে অরলান্ডোর আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ে, আমি আমার মায়ের সাথে বৃষ্টি বাদলের গল্প করি। সে গল্পজুড়ে থাকে বৃষ্টিমুখর দিনে মতিঝিল এজিবি কলোনির বারান্দায় বসে আমাদের পুরোনো সে সব দিনের স্মৃতিচারণ, নড়াইলের চিত্রা নদীর বুকে বৃষ্টির মাঝে নৌ ভ্রমণের গল্প। কিংবা নানাবাড়ির বৈঠকঘরে বসে নানীর ভাঙা রেকর্ডের গান শোনার সাথে নারকেলের নাড়ু খাবার গল্প।

যেদিন সকালে অরলান্ডোর শহরজুড়ে চকচকে রোদ ওঠে, আমি আমার মায়ের সাথে রোদেলা দিনে খড়রিয়ার বিলের গল্প করি। সে গল্পজুড়ে থাকে ফেদা মামার নৌকা বাইচের স্মৃতি, ফরিদ মামার সাথে শিকারে যাবার নেশার হাতছানি। আমাদের দীঘির বুকে নৌকা চালানোর স্মৃতিচারণ করেন আমার মা। এ জনমে আবার দেখা হবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন তিনি। দুজনেই চুপ করে থাকি খানিকক্ষণ। তখন মা জিজ্ঞেস করেন,

'কাজে পৌঁছে গেছো বাবা?'

আমার মনে আছে, আজ থেকে প্রায় সাতাশ বছর আগে যখন আফ্রিকার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ছাড়লাম, আমার মা আমার স্যুটকেসে দু'কেজি চালের একটা প্যাকেট দিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন বাবা তোর ভাতের কষ্ট যেন না হয় ওই জীবজন্তুর দেশে। সে সব কথা নিয়ে আজও এক গাল হাসি আমরা। জাম্বিয়ার এক প্রত্যন্ত শহর মজবুকতে ছিলাম বেশ কিছুটা সময়। তখন আমার ডাকবাংলো থেকে প্রায় প্রতিদিন রাত দুপুরে প্রশ্ন করতাম তাঁকে রান্নার রেসিপি নিয়ে। আজও করি। তাঁর রন্ধন প্রণালীর নিখুঁত বর্ণনা শুনে আমি অনেক স্মৃতির সিঁড়ি বেয়ে নেমে পড়ি অনেক নিচে।

আমার মা নিউইয়র্কে এসেছিলেন আমার বিয়ের অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠান শেষে তাকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম নায়েগ্রা জলপ্রপাতে। একটা ছোট জাহাজ করে যখন জলপ্রপাতের কাছাকাছি পৌঁছলাম, আমার মা তখন চিৎকার করে তারস্বরে গান গেয়ে উঠেছিলেন। আমার মা সাধারণত গান গান না। তবে তিনি গানের একনিষ্ঠ শ্রোতা। আমার বাবা গলা ছেড়ে গান গাইতেন আমাদের

মতিঝিলের বাসায়। মা মুড়ি মেখে আনতেন। কিংবা ভাজা পিঠে। আমার সব প্রিয় গানের সাথে মায়ের মমতা মাখা।

আমার সারা জীবনের শখ বিশ্বমানব হবার। সে শখটি বুনে দিয়েছিলেন আমার মা। ভূগোল পড়াবার সময় খুব মজা করে সারা দুনিয়ার গল্প বলতেন তিনি। আমি মুগ্ধ হয়ে তা শুনতাম। আর তাই আমাজনের উৎস খুঁজতে ছুটে বেড়াই ইকুয়েডরের বানিওসে, তিব্বতের লাসায় খুঁজে বেড়াই ব্রহ্মপুত্রের উৎস আর কাঞ্চনজঙ্ঘায় খুঁজি হিমালয়।

আর কিছুদিন পর আমার মেয়ে আমাদের ছেড়ে চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়তে বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাবে। মাঝেমধ্যে মাকে আমার উৎকণ্ঠার কথা বলি। আমার মা আমাকে সান্তনা দেন সব সময়। মনে করিয়ে দেন তার জীবনের সবচেয়ে সুখের দিন ছিল যেদিন আমি চিকিৎসক হলাম। আর আমার জীবনেও যেন সে দিন আসে সেই প্রার্থনা তিনি করেন সব সময়। আমাকে কাছে না পাবার দুঃখকে তিনি বরণ করে নেন আমার জীবনের সব প্রাপ্তির কাছে। কঠিনেরে ভালোবেসেছেন তিনি।

সেদিন বললেন ,

'এবারের রমজান মাসে আমি দিনে রাতে বেশি বেশি করে কোরান খতম করে তোমাদের জন্য প্রার্থনা করছি। জানি না আগামী রমজানে থাকবো কিনা।'

আমার গলা ধরে আসে মা'র মুখে এসব কথা শুনলে। আমি ওসব শুনতে চাই না।

প্রতিদিনই আমার মায়ের দিন। আমার মা আমার হৃদয়জুড়ে থাকেন প্রতিদিন। মধুর আমার মায়ের হাসিতে হেসে ওঠে আমার প্রতিটি দিন।

দিজয় দিবসের স্মৃতি

"হারাতে হারাতে চলি, খুঁজে পাই
ইচ্ছে হয় একটু দাড়াই।"

সাত- আট বছর বয়স আমার। আজকের এই দিনে বাবা আমাদের তিন ভাই বোনকে নিয়ে বের হলেন রাতের ঢাকা শহর দেখতে। আলোতে ঝলমল শহর। মতিঝিল, পল্টন, সচিবালয়, হাইকোর্ট হয়ে রমনার সামনে থামলাম সবাই। চটপটি-ফুচকা খেয়ে বাসায় ফেরার পথে থামলাম মরন চাঁদের মিষ্টির দোকানে। বিজয় দিবস উপলক্ষে মিষ্টি কেনা হলো। হৈ হৈ করতে করতে ফিরলাম ঘরে। এটি আমার প্রথম বিজয় দিবসের স্মৃতি।

আজ বাবার সাথে ফোনে নিয়মিত আলাপচারীতার মাঝে স্মরণ করিয়ে দিলাম তাঁকে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তিনি বললেন, আজ খুব ইচ্ছে ছিল আমার ছোট ভাই–এর ছেলেকে নিয়ে বেরুবার। কিন্তু তিনি আজ বড় দ্বিধায় আছেন। অজানা শঙ্কা তার মনে আজ।

এ সময়টাতে মতিঝিল কলোনিতে বিজয় দিবসে নানা ধরনের অনুষ্ঠান হতো।ব্যাডমিন্টন খেলা, কনসার্ট, আতশবাজি। রাতে আমরা বন্ধুরা মিলে রিকশা ভাড়া করে ঘুরতাম সারা শহর। বাসায় সব সময়ই রান্না হতো সুস্বাদু খাবার।

মেডিকেল কলেজে বি মেসে রান্না হতো পোলাও-কোরমা। বিজয় দিবসে কিছু না কিছু অনুষ্ঠান তো হতোই। সাহিত্য সম্পাদক থাকাকালে সব সময়ই একটি প্রকাশনা তো হয়েছেই। আর্ট কলেজ-শিল্পকলা একাডেমী-ডিসি হিলের দিকে যেতাম কখনো কখনো। ভারি ইচ্ছে করে আজ যদি সে সব দিনে ফিরে যেতে পারতাম।

ঢাকা কলেজে পড়ার সময় সোবহান বাগে যেতাম অধ্যাপক নুরুন্নবির বাসায় পড়তে। পাশেই আমাদের জাতীয় সংসদ ভবন। সময় পেলেই এক অদ্ভুত আকর্ষণে ছুটে যেতাম সেখানে। কয়েকটি বিজয় দিবস কেটেছে সেখানে। লুই কানের এই বিশাল কর্মটির প্রতি আমার এক অজানা ভালবাসা। একটি শিশু যেমন করে অবাক চোখে তাকিয়ে প্রথমবারের মতো এই অবিস্মরণীয় কর্মটি দেখে, আমি প্রতিবারই সেটি দেখেছি একই মুগ্ধতা নিয়ে।

দেশের প্রতি আমার ভালবাসা এই অবিস্মরণীয় ভবনের মতোই বিশাল। যার মাঝে আছে কংক্রিটের কঠিন বাস্তবতা, এ ভবনের চারপাশের জলের মতো মাধুরি মাখা। এ ভবনের চারপাশে কৃষ্ণ চূড়াতে মাখা আছে যেন সব শহীদের চেতনা, আর সব সবুজের মাঝে আছে নিঃশেষ স্বপ্ন।

এ স্বপ্নে আজো উদ্বেলিত হই। সব কালো আঁধারি মেঘের মাঝে সাদা এ কংক্রিটের ইমারত যেমন দাড়িয়ে থাকে, এ বিজয় দিবসে সব আঁধারের মাঝে স্বাধীনতার চেতনাও সেভাবে গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকুক। হোক বিজয়ী।

আজ সকালে আমার ছেলে, নাভানকে নিয়ে দেখলাম অপূর্ব এক তথ্যচিত্র 'My Architect- A Son's Journey.' লুই কানের ছেলে নাথানিএল কানের করা এ অপূর্ব ছবিটি আমার মন ছুঁয়ে গেছে।

হয়তো একদিন নাভান বিজয়ের এই দিনে এই অমর কীর্তির সামনে দাঁড়িয়ে ভাববে তার বাবা কতো ভালবেসেছে এ দেশকে। হাজার হাজার মাইল দূরে থেকেও...!

"এদিন আজি কোন ঘরে গো
খুলে দিল দ্বার।
আজি প্রাতে সূর্য ওঠা
সফল হল কার।"

ছোট খাটো আনন্দ, ছোট খাটো বেদনা

আজ বেশ শীত পড়েছে এখানে। ছুটির দিন। তাড়া নেই কোন কিছুর। রান্নার সুবাস আসছে বাইরের রান্নার জায়গা থেকে। ভালো খাবার দাবার প্রস্তুত হচ্ছে। অপেক্ষার পালা। ভারী কাপড় পরে রোদে বসে আছি আমি আর আমার পুত্র নাবহান। আমরা দু'জনেই খুব উল্লসিত। গতকাল রাতে রেডিও কন্ট্রোল রেসিং বোটটা প্রস্তুত হয়েছে। আজ সুইমিং পুলে মহড়া হবে। দু'জনেই গভীর মনোযোগের সাথে 'নির্দেশনা' পড়ছি।

নাবিহা এসে তাঁর 'তথাকথিত আশঙ্কার' কথা বলে মৃদু তিরস্কার করে গেল। আজ যদি এই বোটটা কাজ না করে তবে তা কাল দীঘিতে চালানো যাবে না। কাল নাকি বড় সুন্দর আবহাওয়া থাকবে!

আমার প্রথম নৌকাটা পেয়েছিলাম দাদার কাছ থেকে। শোলার নৌকা। যশোরে দাদা বাড়িতে পুকুরে ভাসিয়েছিলাম সেই নৌকা। অপার আনন্দে বাবার কোল থেকে নেমে পুকুরের পানিতে খেলা করেছিলাম সেই নৌকা নিয়ে।

বাবার দেয়া প্রথম নৌকাটা ছিল 'ভট ভটি' নৌকা। টিনের তৈরি। একটি ছোট আধারে পানি ভরে, ছোট্ট শোলকে আগুন দেবার পরে, কমলাপুরের ছোট দীঘিতে ছাড়া হলো তা। ভট ভট শব্দ করে সেটা ঘুরতে লাগলো। কি আনন্দই না পেয়েছিলাম সেদিন!

নানা বাড়ির ঘাটে বাঁধা বাইসের নৌকা নিয়ে আমাদের গর্বের শেষ ছিল না। বিশাল লম্বা সেই নৌকা। দু'ডজন লোক বসতে পারত তাতে। গলুইতে কাঁসার কাজ। কাঠ কেটে সারা নৌকাজুড়ে অপূর্ব কাজ। শীতের এ সময়ই নড়াইলের চিত্রা নদীতে হতো 'নৌকা বাইস'।

সেই উৎসবজুড়ে থাকত জমজমাট মেলা, পালাগান, খেজুর গুঁড়ের আমদানি। নলিনি গুঁড়ের সন্দেশের স্বাদ এখনো লেগে আছে জিভে।

নানা বাড়ির নৌকা জিতে নিত পুরস্কার। বড় এক মেডেলের সাথে থাকতো বড় বড় পিতলের কলস, পিতলের থালা- বাটি...আজকাল কি কেউ পিতলের থালা ব্যবহার করেন?

এরই মধ্যে আমরা প্রস্তুত। আমাদের 'রেডিও কন্ট্রোল সুপার ফাস্ট বোটটা' সুইমিং পুলে ভাসল। আমাদের পুত্র নাবহান চরম উৎসাহে আমাকে চালিয়ে দেখাল কিভাবে এই বোটটা কাজ করবে। আমি অদ্ভুত আনন্দে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। ও উল্লাসে ফেটে পরে বলছে,

'এটি আমার সবচেয়ে প্রিয় খেলনা, বাবা...আমি তোমাকে খুব ভালবাসি বাবা...!'

এ মুহূর্তগুলো কোন ফ্রেমে বাঁধানো যাবে না। যাবে না লিখে বোঝানোও। আমি খুব বাবাকে কাছে চাইছিলাম আজ... ক্ষণিকের জন্য...!

"দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো–
গভীর শান্তি এ যে
আমার সকল ছাড়িয়ে গিয়ে
উঠল কোথাই বেজে।"
–রবিঠাকুর।

আজ রবিবার

দু'দিন বিষণ্ন মেঘলা দিনের পর ঝকঝকে একটি সকাল আজ। মনটা এক প্রকার মুক্তির আনন্দে ব্যাকুল। পরিচিত ঘাস-পাতা-জল আজ নতুন বলে মনে হচ্ছে। আজ নতুন করে আমার পারিপার্শ্বিক সৌন্দর্যকে অন্তর্গত করতে ইচ্ছে হলো।

লেকের পাশে বুনো ফুল, অজানা অর্কিড, অসময়ের নতুন কচি পাতা সূর্যের আলোয় উচ্ছ্বল। আজ বুকের গভীরে সন্ধানী জলের প্রপাত।

আমি একটা ছোট দ্বীপের মতো এলাকায় থাকি। চারদিকে দীঘির টলটলে জল। এই দ্বীপটা একটা ছোট্ট সেতু দিয়ে পার হতে হয়। সেতুর ওপর গিয়ে দাঁড়ালাম। হিমেল হাওয়া শিস দিয়ে গেল। বড় বড় পাইন গাছের মাঝে দীঘির নীল জল আজ বড় মায়াবী মনে হচ্ছে। পথের দু'পাশের ঝর্ণাগুলো আজ মনে হয় বাঁধনহারা।

বাড়ির চারপাশে লাগানো দেশি ফলের গাছে এখন খানিকটা পাতা ঝরার সময়। তবে গত দু'দিনের বৃষ্টিতে সব গাছগুলো এখন রয়েছে যেন অসময়ের বসন্ত বিভ্রাটে। কামরাঙ্গা গাছে এসেছে নতুন কলি। অদ্ভুত তার রঙ। কী মাতাল গন্ধ।

শতায়ু ওক গাছের পরগাছা স্প্যানিশ মসগুলো বিবর্ণ হতে যেয়েও হালকা স্বর্ণাভ।

মার লাগানো পান গাছ এক বিশাল জঙ্গলা হয়েছে। তুলে নিলাম প্রচুর পান। কাকে দেবো এসব আজ?

সব ঘুরে ফিরে এলাম ডকে। লেকের পোষা মাছগুলো তাকিয়ে আছে। নাভান ছড়িয়ে দিল কিছু মুড়ি। এই বুনো প্রকৃতিতে বেড়ে ওঠা এসব মাছের কী উল্লাস তাই নিয়ে!

হুট করে খবর পেলাম যেতে হবে হাসপাতালে। জরুরি বিভাগে লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টের এক রোগি এসেছে রক্তবমি নিয়ে। এই মায়াবী পরিবেশ ছেড়ে ফিরে গেলাম বাস্তবে। জরুরি অপারেশান করে ফিরে এলাম নিজ নিস্বর্গে ... সূর্য ডোবার আগেই। বোট নিয়ে বেরুলাম। মেঘ আর সূর্যের অপূর্ব খেলা দেখতে দেখতে কেটে গেল সময়। সূর্যাস্তে অস্প্রি ঈগল নির্ভয়ে বসলো শত বছর পুরনো সাইপ্রাস গাছে। সময়ের উপকণ্ঠে রাত ঘনিয়ে এলো। ঢেউয়ের সাথে সাথে সবাই ফিরছি ঘরে... জীবন স্রোতে এ এক অপার আনন্দক্ষণ।

"জীবন- স্রোতে ঢেউয়ের পরে
কোন এলো এই বেড়াই দুলে?
ক্ষণে ক্ষণে দেখি যে তাই

বসে বসে বিজন কুলে।”
–রবিঠাকুর।

সংখ্যালঘুর মেঘলা দিন

আজ অরলান্ডোতে মেঘলা দিন।

ঠান্ডা মৃদুমন্দ বাতাস।

গরমকাল শেষ।

বৃষ্টির দিনও শেষ। বাড়ির পিছনের উঠোনে বসে সবুজ দেখছি। হিমেল একটা হাওয়া থেকে থেকে ঝাপটা দিয়ে যাচ্ছে চোখেমুখে।

আমার মায়ের হাতে লাগানো গাছগুলো অনেক বড়ো এখন। দীঘির পাড়ে মৃদুমন্দ বাতাসের সাথে ওরা খেলছে।

গতকাল জেনি নামের প্রায় আশি ছুঁই ছুঁই এক ভদ্রমহিলা আমার অফিসে এসেছিলেন। জেনিকে দেখলেই আমার মায়ের কথা মনে হয়। তিনিও তাঁর মতো শিক্ষকতা করতেন। তার জন্ম নিউ ইয়র্কে। বড়ো হয়েছেন সেখানেই। খুব মমতাময়ী একজন মানুষ। ব্রনক্স নামে সেখানকার এক দরিদ্র এলাকাতে স্কুলে চাকরি করতেন তিনি। পোর্টারিকো নামের এক দ্বীপের প্রচুর গরিব লোকজন ওখানে থাকতো। তাদের বাচ্চাগুলোকে ইংরেজি শেখানো থেকে শুরু করে তাদের সামাজিক সমস্যা সমাধানের কাজগুলো তিনিই করতেন। নিজের পরিবারকে আগলে রেখে সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য কাজ করে বেড়াতেন তিনি। খানিকটা আমার মায়ের মতো। অবসর নেবার পর নিউইয়র্কের ঠান্ডা ছেড়ে চলে এসেছেন এ শহরে।

তার একমাত্র মেয়ে এখানো থাকে নিউইয়র্কে। সেই মেয়ে তাঁর নাতিপুতিদের নিয়ে ছুটিতে বেড়াতে আসে এখানে। এখানে আসলে সে-ও তাঁর মায়ের খোঁজখবর নিতে তাঁর মায়ের সাথে আমার কাছে আসে।

জেনি খুব আত্মনির্ভর একজন মানুষ। তিনি আমাকে প্রায়ই বলেন, যেদিন তিনি পরনির্ভর হবেন, বিধাতা যেন তাকে তুলে নিয়ে যান। এই বয়সেও মহিলার আত্মঅহংকার আমার ভালো লাগে।

গতকাল জেনি বললেন, সেবছর ইরমা নামের ঘূর্ণিঝড়ে যে সব পোর্টারিকান তাদের পরিচয়পত্র, ঘরবাড়ি হারিয়েছে তাদের জন্য 'আই চেক' নামে একটি প্রতিষ্ঠান খুলেছেন তিনি। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি প্রায় তিন'শ জনকে সাহায্য করেছেন। আমি তাঁর কাজে মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

জেনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'খবরে দেখলাম বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। কিছু করছ তোমরা? আমি কিছু সাহায্য করতে চাই তাদের।'

আমি নীরব হয়ে গেলাম।

জেনি এদেশের সংখ্যালঘু কৃষ্ণাঙ্গ। ওর জীবনের পথচলা কখনই সহজ হয়নি। তাই যে কোনো সংখ্যালঘুদের কষ্ট তাকে স্পর্শ করে। ও ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় তাদের জন্য। আমার মেয়ে যখন রোহিঙ্গাদের জন্য সবার কাছে সাহায্য চাইছিল, জেনি তাঁর চার্চে গেয়ে কিছু পয়সা তুলে তার হাতে তুলে দিয়েছিল।

আমি জেনিকে কথা দিলাম ওকে জানাবো। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, সংবাদপত্র আর খবরে এ ব্যাপারটি বেশ ঝড় তুলেছে তখন। বাংলাদেশে আর অনেক ঘটনার সাথে এটিও হয়ত মিশে যাবে। হারিয়ে যাবে। আমি এখনো খুঁজছি এ সংখ্যালঘুদের সাহায্যের জন্য কেউ কোন উদ্যোগ নিয়েছেন কিনা।

এদেশে তো আমরা সংখ্যালঘু। এরকম কি হতে পারে আমাদের ভাগ্যে?

দূরে কোথাও বিজলি চমকাল। যে কোনো সময় বৃষ্টিও হতে পারে। মেঘলা দিনে কত কী যে মনে আসে। কত দুঃখ বেদনা যে চোখের তারায় ভাসে! মেঘলা আকাশের কী আসে যায় তাতে?

আশা আর ঝাল মুড়ির গল্প

কনকনে ঠান্ডা আজ। সকাল থেকে টিপ টিপ বৃষ্টি।

অফিসের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেই মনটা কেমন যেন বিষণ্ন হয়ে পড়ে। এই শীতের দিনেও রোগির কমতি নেই। ঘড়ির কাঁটা ধরে রোগি আসছে। এ রকম দিনে ঘরে একটু আগে ফিরতে সাধ হয়। ঝাল মুড়ি খেতে ইচ্ছে হয়। সব সাধ তো আর পূর্ণ হয় না।

আমার সহকারীকে নিয়ে আমার বেশ পুরনো এক রোগির রুমে ঢুকলাম। মহিলার বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে। যকৃতের কঠিন ব্যাধি। গত সাত বছর ধরে শক্ত মনে যুদ্ধ করছে সে। তাঁর শখ এবার শীতে কলোরাডো যাবে। স্কি করতে ইচ্ছে হচ্ছে। মানুষের সাধ আহ্লাদ তো থাকবেই। খানিকক্ষণ ধরে আলাপ করলাম। সব কিছু শুনে আপত্তি করলাম না। হাসপাতাল আর ডাক্তার তো সবখানেই আছে। তাঁর পুরনো বন্ধুকে নিয়ে এসেছে আজ। তাঁর সঙ্গী হবে সে এই যাত্রায়। সত্তরোর্দ্ধ একজন ভদ্রলোক।

দু'জনের ছেলেমেয়ে নেই কেউ। দু'জনেই জীবনকে বড় ভালোবাসেন। ভালোবাসেন প্রকৃতিকে। দু'জনেই বড় হয়েছেন নিউইয়র্কে। দু'জনেই পেশায় শিক্ষক। অথচ দেখা হয়নি নিউইয়র্কে। এখানের এক বৃদ্ধাশ্রমে তাঁদের চেনা জানা।

দু'জনেরই বড় সখ একটা বড় জঠ ভাড়া করে আলাস্কা যাবার। যাবার পথে সব সুন্দর সুন্দর পার্ক গুলোতে কিছুদিন কাটিয়ে প্রকৃতিকে আরও কাছ থেকে দেখার। এ আশাটা বড় কঠিন তাঁর জন্য।

এ শখ তো আমার ও আছে। বলা যায় না। হয়তো সখ পূর্ণ হতেও পারে। অন্তত আজ একটি আশা পূর্ণ হয়েছে।

ঘরে এসে এ বৃষ্টি মুখর ঠান্ডা দিনের শেষে সরষে তেলে বানানো ঝাল মুড়ি খেয়ে মনে হলো– 'আশা তো আমরা করতেই পারি...। আশা তো হয় আশা পূরণেরই জন্য।'

একটি সূর্যহীন দিন

সারাদিন মেঘলা আকাশ। এমনটা কিন্তু হবার কথা না এ সময়। সাধারণত তীব্র রোদ থাকে সারাদিন। তারপর আধাঘন্টার জন্য তুমুল বৃষ্টি। সে বৃষ্টি শুষে নেবে সব তীব্র দাহ।

সারাদিন কাজ থেকে ফিরে ডকে বসেছি। হালকা ঠান্ডা বাতাস, পানির মৃদুমন্দ শব্দ, কাশবনের অলস হেলে দুলে পড়া, দূর থেকে ভেসে আসা পাখির ডাক। বসে আছি সূর্যাস্ত দেখবো বলে। যদি মেঘের কোলে সূর্য নামে আজ।

না বলেই শুরু হল মুষলধারে বৃষ্টি। পড়ছে বাজ। দমকা হাওয়ার সাথে বৃষ্টির ঝাপটা এসে লাগছে মুখে। সবকিছু বদলে গেল চারদিকে।

একটি সূর্যহীন দিন।

এরকম এক সূর্যহীন দিনে পরিচয় হয়েছিল আবদুল্লা ভাইয়ের সাথে। আমি তখন মেডিক্যাল কলেজে প্রথম বর্ষের ছাত্র। সময় পেলে 'সন্ধানী' তে বসি সন্ধ্যের দিকে। দু'জনে একসাথে বসে বেশ খানিকক্ষণ আলাপ করলাম। ধীরস্থির তাঁকে মনে গেঁথে গেল। তারপর তাঁকে অনেক খুঁজেছি। পাইনি কোথাও।

অনেক দিন পর জানলাম তাঁর দুরারোগ্য ব্যাধি। বেশীদিন বাঁচবেন না। খুব দেখতে ইচ্ছে হল তাঁকে। সে সুযোগ হল না। তিনি সবাইকে ছেড়ে চলে গেলেন। যাবার আগে চোখ দু'টি দান করে গিয়েছিলেন। তাঁর চোখ দিয়ে সারা পৃথিবী দেখেছিল একটি ছোট মেয়ে। সেই মেয়েটিকে দেখেছিলাম। তার চোখের দিকে তাকিয়ে এক স্বর্গীয় দ্যুতি দেখেছিলাম।

আরেক সূর্যহীন দিনে দেখা হয়েছিল রাজুর সাথে মেডিকেল কলেজেই। রাজু মৃদু হেসে পরিচয় দিয়েছিল তার। মেডিকেলে পড়ার ইচ্ছে নেই... পড়িবারের চাপে পড়ে এসেছে। দু'জনের মাঝে কখনোই সম্পর্কটা গভীর ছিল না। আমি মেডিকেল কলেজে প্রতিদিন খুঁজে ফিরি নতুন আকর্ষণ, নতুন বন্ধু ...আমার শিকড় থিতু হবার গভীরটা খোঁজে প্রতিক্ষণ। অথচ রাজুর বন্ধু-বাৎসল্য ছাড়া অন্য কিছুতে নেই তেমন উৎসাহ। সময় পেলেই ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যেতো সে ঢাকায়। সেই যে এক সন্ধ্যায় চলে গেল... একাকী...! আর ফিরে এলো না। বড়ো অভিমানী সেই প্রস্থান।

এসব সূর্যহীন দিনে একা থাকতে ইচ্ছে হয়।

বৃষ্টির সাথে কাঁদতে ইচ্ছে হয়।

'বড় ভাইসাহেব, দেখেন আপনার মুসলিম লীগের লোকেরা কী করেছে, তারা ছাত্রদেরকে গুলি করে শেষ করে দিচ্ছে আর আপনারা অ্যাসেম্বলি হলে বসে পাকিস্তানের গুণগান গাইছেন।'

এক নাগাড়ে এ কথাগুলো বললেন আব্দুল হাফিয তাঁর বড়ভাই, আব্দুল হামিদ সাহেবকে। আব্দুল হামিদ সাহেব তাঁর ছোট ভাই আব্দুল হাফিযের দিকে তাকিয়ে লক্ষ করলেন তাঁর সারা গায়ে রক্ত মাখা। সময়টা ২১ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২ সাল। আব্দুল হাফিয ভাই তখন ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র।

নিজেকে কখনোই 'ভাষা সৈনিক' হিসেবে দাবি করেন নি হাফিয ভাই। জন্ম ১৯৩০ সালে, ফেব্রুয়ারিতে। ঢাকার মাহুত টুলিতে বড় হয়েছেন। তাঁর নানা ১৮৮০ সালে লখনউ থেকে চলে আসেন ঢাকাতে। নানী ঢাকার মেয়ে। বড় হয়েছেন বাংলা আর উর্দু দু'ভাষা শিখে। দু'ভাষাতেই ছিল সমান দখল। হাসতে হাসতে বলেন 'কুট্টি বাংলাতেও' আমি সমান দক্ষ। আরমানিটোলা হাইস্কুলে পড়ার সময়টা ছিল স্বপ্নের সময়। মাহুত টুলি আর বেচারাম দেউড়িতে হিন্দু মুসলমান সবাই মিলে কী সুন্দর দিনই না কাটিয়েছেন! শিক্ষকরা শিখাতেন কেবল সহমর্মিতা আর সমতার সমাজ গঠনের পথের ঠিকানা।

সেই সময়েই দেখেছেন ধর্ম আর জাত নিয়ে অনেক বৈষম্য, অনেক রক্তপাত। সেই থেকে রাজনীতিতে তাঁর বিতৃষ্ণা। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন রাজনীতি আমাদের বিভক্ত করে, আমাদের মধ্যে হিংস্রতা নিয়ে আসে।

সে সময় দেখতেন, রাজনীতি করে অনেক ছাত্র 'আদুভাই' হয়ে বছরের পর বছর কাটিয়ে দিতেন মেডিকেল কলেজে। তাঁর সে বিলাসিতার সময় বা সুযোগ ছিল না।

মেডিক্যাল কলেজে ঢুকে তাই রাজনীতি করেন নি। গান গাইতেন, পিয়ানো বাজাতেন। 'ঢাকা শিল্পী সংঘের' সদস্য ছিলেন। ১৯৫২–র ২১ শে ফেব্রুয়ারিতে হরতাল ছিল। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছয় নাম্বার ব্যারাকে বসে পরীক্ষার জন্য পড়াশুনা করছিলেন কয়েক বন্ধু। ২১ শে ফেব্রুয়ারির মিছিলে যান নি, পরীক্ষার পড়ার জন্য। যখন বন্দুকের গুলির শব্দ শোনা গেল, ফজলে রাব্বির রুম থেকে সবাই বেরিয়ে বারো নাম্বার ব্যারাকের দিকে দৌড়ে গেলেন। রক্তে মাখামাখি একটি মানুষ কে দেখলেন গেটের পাশে পড়ে আছে। কয়েক বন্ধু মিলে তাঁকে ধরে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলেন। তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হলো। পুরো ঘটনাটাই তাঁকে থমকে দিল। মুহূর্তেই বদলে গেল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি।

সেই থেকে উর্দু বলা ভুলে গেল সেই উঠতি বয়সের যুবকটি। আজও সেটি বদলায়নি।

যে কোনদিন রাজনীতির ধার কাছ দিয়েও যাননি, সেদিন রাতে আরও অনেকের সাথে মিলে কার্ফু ভেঙ্গে সারা রাত জেগে বানিয়েছিলেন প্রথম শহিদ মিনার। সেদিন সেটির ছবি তুললেন হাফিয ভাই। শহিদ মিনারটি ভেঙে ফেলা হয়েছিল। হাফিয ভাইয়ের সে ছবিটি বাঙ্গালীর ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে গেল।

হাফিয ভাই বললেন, 'যদিও মুসলিম লীগ জন্মেছিল এই ঢাকাতে ১৯০৬ সালে, ২১ শে ফেব্রুয়ারির পর আমি দেখেছি তাঁদের আসল চেহারা। ওদের কোন দিন সমর্থন করিনি।'

আমেরিকাতে চলে এলেন ১৯৫৭ সালে। এদেশেও কোন রাজনীতির ধারে কাছে যাননি। রাজনৈতিক দলে বিশ্বাস করেন না। যাকে ভালো লাগে, যার দ্বারা মানুষের ভালো হবে মনে করেন তাকেই সমর্থন করেন।

প্রায় এক যুগেরও বেশি হলো অবসর নিয়েছেন ডাক্তারি পেশা থেকে। ফ্লোরিডার চমৎকার পরিবেশে থাকেন। বাংলাদেশের মতো সবুজ চারদিকে। দেশের সব ফলমূল লাগিয়েছেন বাড়ির আশেপাশে। ঘরে ঢুকতেই গন্ধ পান রজনীগন্ধার। বাংলা গান শোনেন। বাংলা বই পড়েন। আকাশের দিকে তাকালেই দেখেন সাদা মেঘের ভেলা। হাফিয ভাই আমাকে হাসতে হাসতে বললেন,

'জীবনের শেষ ক'টা দিন এখানেই কাটবে, আমিতো আমার সোনার বাংলাতেই আছি। আশপাশের সব কিছু আমাকে কেবল আমার প্রাণের বাংলাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।'

এই ফেব্রুয়ারিতেই তাঁর জন্ম, ফেব্রুয়ারি তাঁকে করেছে বাঙালি, ফেব্রুয়ারি তাঁর চেতনা। গত ফেব্রুয়ারিতে হারিয়েছেন তাঁর প্রিয় জীবন সঙ্গিনী, ডাঃ রউনককে। এই একলা জীবনে পূর্ণতা এনে দেয় তাঁর বাঙ্গালিয়ানা।

প্রায় এক যুগ আগে আমি তাঁকে মঞ্চে ডেকেছিলাম একুশের স্মৃতিচারণ করবার জন্য। মঞ্চে দাঁড়িয়ে দরাজ গলায় গান গেয়েছিলেন তিনি সেদিন, চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছিল নোনা জল–

"বাংলা আমার তৃষ্ণার জল,
তৃপ্ত শেষ চুমুক।
আমি একবার দেখি, বারবার দেখি, দেখি বাংলার মুখ।"

ধন্যবাদ দেওয়ার দিন

সুজানের বয়স ৮৬ হবে শিগগিরই। প্রতিদিন ভোরে সুজান হাজির হন আমার আগেই। আমার রোগিদের পাশে হাসি মুখে দাঁড়িয়ে কুশলাদি বিনিময় করেন তিনি। তাঁদের সাহস দেন। ওর কাছ থেকে না চাইতেই জল পেয়ে যায় অনেকেই। সুজান একজন নিঃস্বার্থ 'স্বেচ্ছাসেবক!'

এ দেশের প্রতিটি হাসপাতালের এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে আছে এ রকম অনেক স্বেচ্ছাসেবক।

সুজান বড় হয়েছেনিউ ইয়র্কে। বিয়ে হবার পর নর্থ ক্যারোলিনাতে ছিলেন ৪০ বছরের ও বেশি সময়। এরপর এ শহরের বাসিন্দা। তিনি ছিলেন একজন পুরদস্তুর অফিসের কেরানি, পুরো সময়ের জন্য মা– একজন স্ত্রী এবং বিদগ্ধ একজন পাঠিকা। ইতিহাস পড়তে ভালোবাসেন। এখন পুরো সময়ের জন্য আমদের একজন স্বেচ্ছাসেবক। পাশাপাশি বছরে ২ মাস মানব সেবার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেন।

সুজানের ৫ টি সন্তান। ছোট মেয়েটি কাছাকাছি থাকে। বাকি সব এদেশের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

ছ'বছর আগে বিধবা হয়েছেন। দীর্ঘ ৫৫ বছরের মায়াময়ী জীবনের পরে জীবনকে থমকে দেননি তিনি। নিত্যদিন মানুষের মাঝে তিনি তাঁর অপূর্ব সুন্দর অস্তিত্ব খুঁজে পান। ওকে জিজ্ঞেস করলাম,

'Thanks giving এ উধুতে কী করছ?'

হাসিমাখা মুখে তাঁর জবাব,

'ডাক্তার, তোমার কোন উপকারে আসতে পারি কি? আমি খুব ভালো রাঁধুনি।'

আমাদের চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অজশ্র সুজান। আমরা ভাগ্যবান। ধন্যবাদ জানানোর দিন তো এসব সুজানদের...!

শখের জীবন, জীবন শখের

মাইকসন দম্পতিকে আমি কমবেশি এক যুগ ধরে চিনি।

প্রতি ক' মাস অন্তর কোন না কোন কারণে তাঁদেরকে আমার অফিসে আসতে হয়। অনেক সময় তারা আসেন কোন কারণ ছাড়াই। কোন ওষুধের দরকার নেই, ভালোই চলছে সব কিছু। আমি বলি,

'কি করতে পারি তোমাদের জন্য?'

এক গাল হেসে তারা বলেন, 'ডাক্তার তোমাকে দেখতে এসেছি। ভাবলাম খানিকটা গল্প করে যাই।'

তারা মনে করেন আমি একজন আকর্ষণীয় মানুষ। আমি সারা দুনিয়া ঘুরে কেমন করে এখানে এসেছি তা তাঁদের আগ্রহের ব্যাপার। বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁদের অনেক আগ্রহ। তারা মনে করেন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। তাঁদের কথা শুনে আমার চোখমুখ জ্বলজ্বল করে। তারা তাতে আনন্দ পান। তাঁরা জানে যে আমি একজন স্বপ্নচারী মানুষ। আমার কাছে এই দম্পতিও বড় আকর্ষণীয়।

জেমস আর টারা মাইকসন গত ৪৫ বছর ধরে বিবাহিত। হাইস্কুল থেকে একজন আরেকজনকে জানে-চেনে। বয়সের খুব একটা হের ফেরও নেই। এদেশে যাকে বলে একজন আরেক জনের 'সুইট হার্ট'। বেড়ে উঠেছেন কলোরাডোর ছোট্ট এক শহর 'এসপেনে'। ছবির মতো শহর। গল্পের মতো জীবন।

জেমস হাইস্কুল শেষ করে চলে আসেন নিউইয়র্কে। সাথে আসে টারা। একজন সাংবাদিক হিসেবে জীবন শুরু। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় টাইম স্কয়ারে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে মারাত্মক আহত হন। অনেক দিন থাকতে হয় বিছানাবন্দি। সে সময় টারা তাঁর পাশে ছিল সর্বক্ষণ। ছায়ার মতো। একটা ছোট চাকরি করে সে সংসার চালিয়েছে, জেমসকে দেখে রেখেছে। জেমস ভালো হয়ে ওঠার পর 'রচেসটার' নামের এক শহরে এসে কোডাক কোম্পানিতে কাজ শুরু করেন। সেই থেকে আলোকচিত্রের প্রতি তাঁর প্রবল ঝোঁক। সারা দুনিয়া ঘুরে ছবি তোলার ভীষণ সখ তাঁর।

কিন্তু, শারীরিক কারণে খুব বেশি ভ্রমণ করতে পারেন না জেমস। এ শহরে আছেন প্রায় দু'যুগ। জীবনটা এ শহরে শেষ হবে বলে তাঁর বিশ্বাস।

অবসর জীবন বলে কোন কিছু এ দম্পতির অভিধানে লেখা নেই। দু'জনেই পাল্লা দিয়ে বই পড়েন। জেমস কাঠের খেলনা বানান সময় পেলেই। তাঁদের নিজেদের কোন সন্তান নেই। তারা কাঠের চমৎকার খেলনাগুলো শিশুদের হাসপাতালে দিয়ে আসেন অসুস্থ বাচ্চাদের জন্য। টারা খুব চমৎকার উলের কাজ

করেন। উল দিয়ে কত কিছু যে সে বানাতে পারে সে এক বিধাতাই জানেন। উলে বোনা ছোট ছোট কাজ অশুস্থ শিশুদের জন্য দান করে দেন।

মাইকসনদের জীবনে অনেক শখ। অবসর কাটানোর জন্য কোন চিন্তা নেই তাঁদের। তাঁদের জীবন ছোট ছোট শখে ভরা। এ সব ছোট ছোট শখগুলো তাঁদের এক স্বর্গীয় সুখে ভরে রাখে। কত ভাগ্যবান তারা!

আজ টারা মাইকসন আমার জন্য ছোট একটা উপহার নিয়ে এসেছেন। আমি ও একজন ভাগ্যবান মানুষ।

সুতোর টানে

সুলতান সাহেবকে আজ সন্ধ্যেবেলা নিজের কবর নিজেকেই খুঁড়তে হচ্ছে। তাঁর সাথে আরও বেশ ক'জন যোগ হয়েছে। ক্যান্টনমেন্টে বন্দি শিবিরে নিয়মিত অমানবিক অত্যাচারের পাশাপাশি কবর খোঁড়া ছিল আরও একটি কাজ। দিনটি ছিল ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১। তাঁর বয়স তখন ১৭ বছর। তিনি ভাবেন নি একদিন নিজের কবর নিজেকেই খুঁড়তে হবে।

কবর খোঁড়ানোর পর সেখানে তাঁদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হলো। যখন ব্রাশ ফায়ার শুরু করবে পাকিস্তানী মিলিটারিরা, অমনি মুষলধারে বৃষ্টি নেমে এলো। প্রবল বৃষ্টি। অন্ধকার আকাশে বৃষ্টির ঝাঁপটা আর ভয়ে সুলতান সাহেব নিজেই নিজের খোঁড়া কবরে পড়ে গেলেন। ব্রাশ ফায়ের শুরু হলো। বৃষ্টির বেগ আরও বাড়ল। মিলিটারিরা কবরে উঁকি না মেরেই চলে গেলো ব্যারাকে।

সুলতান সাহেব মাটির সোঁদা গন্ধ পাচ্ছেন। বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটাগুলো তাঁকে বাস্তব আর আবাস্তবের ঘোরে নিয়ে যাচ্ছে। নিজের খোঁড়া কবরে শুয়ে অসাড় অবস্থায় সব পুরনো স্মৃতি গুলো তাঁকে জড়িয়ে ধরল।

তাঁর জন্ম ৭ জুন, ১৯৫৩। চট্টগ্রামে। পাহাড়তলির রেল ষ্টেশনের পাশে একটি পাহাড়ের উপরের সেই বাংলো বাড়ির স্মৃতিটা মনে এসেও যেন মুছে গেল তাঁর। বাবা বদরুদ্দিন আহমেদ ছিলেন ভেড়ামারাতে একজন সরকারী কর্মকর্তা। সেখানকার স্মৃতি কেবল মার্বেল আর ডাংগুলি খেলার। তাঁর মনে পড়ে গেল ঢাকার মোহাম্মাদপুরের বাসার কথা, লালমাটিয়া স্কুল হয়ে ল্যাবরেটরি স্কুলে ভর্তি হবার স্মৃতি, ঢাকা কলেজের প্রিয় শিক্ষক আবদুল্লাহ আবু সাইদ সারের ক্লাসগুলোর মধুর স্মৃতি।

সব স্মৃতিগুলো জটিল হয়ে এলো ১৯৭১ সালে। তখন তিনি ঢাকা কলেজে দ্বিতীয় বর্ষে পড়েন। পড়াশুনাতে বেশ ব্যস্ত। তারই মাঝে তিনি উপলব্ধি করলেন, দেশের সাধারণ মানুষরা কিভাবে তাঁদের জীবন বিলিয়ে দিচ্ছে দেশের জন্য। তাঁর বড় দু'ভাই তখন ভারতে চলে গিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং ক্যাম্পে। তিনিও যেতে চাইলেন। মনটা বাধ সাধল। তিনি চলে গেলে তাঁর বাবা-মাকে দেখবে কে?

সে সময় মুক্তিযুদ্ধের নয় নাম্বার সেক্টরের কম্যান্ডার মনোয়ার আলি সাহেবের সাথে পরিচয় হলো তাঁর। প্রায়ই কথাবার্তা হতো তাঁদের। মুক্তিযোদ্ধাদের কাজ সঠিকভাবে চালানোর জন্য প্রচার প্রসারের দরকার ছিল। তাঁকে দায়িত্ব দেয়া হলো এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার। এজন্য দরকার ছিল একটা ছাপার প্রেসের। অতো বড় একটা মেশিন তো দিন দুপুরে দখল করার সুযোগ

ছিল না। তিনি সময় নিয়ে মেশিনটি দেখলেন। বিকল্প হিসেবে চমৎকার একটি পরিকল্পনা করে ফেললেন। যুতসই প্রযুক্তিতে বানিয়ে ফেললেন একটি চমৎকার ছাপানোর যন্ত্র, 'সাইক্লোষ্টাইল মেশিন'। (এ মেশিন পরবর্তী সময়ে তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দেয়। গবেষক ও আবিষ্কারক হিসেবে দেশে বিদেশে স্বীকৃতি পেয়েছেন তিনি।) প্রতিদিন তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন পরিকল্পনাগুলো সেই ছাপানোর যন্ত্রে ছাপিয়ে বিতরণ করতেন সব মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে।

ধীরে ধীরে তিনি শিখে গেলেন কিভাবে গ্রেনেড হামলা করতে হয়। তাঁর প্রথম অপারেশন ছিল 'ধানমণ্ডির পাওয়ার স্টেশনে' সফল হামলা। তাঁর এসব কাজের কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিল তাঁর এক প্রতিবেশী যে ছিল শান্তি বাহিনীর সদস্য। ২৩ শে জুলাই রাতে পাকিস্তানী আর্মি তাঁদের বাড়ি ঘিরে ফেললো। তাঁকে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হলো। শুরু হলো অন্তহীন আমানবিক নির্যাতন। ছাদের রডে ঝুলিয়ে তাঁকে পেটানো হতো, চেয়ারে বসিয়ে ইলেকট্রিক শক দেয়া হতো। তাঁকে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হতো। তিনি অস্বীকার করতেন। জানতেন স্বীকার করলে সেটিই হবে সবকিছুর শেষ। মাঝেমধ্যে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হতো আর্মি অফিসারদের বাসা পরিস্কার করার জন্য। গত রাত থেকে চলেছে তাঁর প্রতি লাগাতার নির্মমতা।

অন্ধকার বাড়ার সাথেই বৃষ্টি বাড়ছিল। সব ঝুঁকি নিয়ে কবর থেকে বের হলেন তিনি। সারা রাত কাটালেন বনের মাঝে। ভয় বা অন্য কিছু কাজ করেনি মাথায় সে সময়। এক সহৃদয় স্কুটার চালক তাঁকে বাসার ধারে নামিয়ে দিল। ঢাকা ছেড়ে চলে আসলেন রাজশাহীতে তিনি। দেশ স্বাধীন হলো। রাজশাহীর প্রথম বিজয় মিছিলে ছিলেন তিনি।

সুলতান ভাই আমার খুব কাছে থেকে দেখা একজন মুক্তিযোদ্ধা। তার অনুভুতির কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,

'যুদ্ধের অনুভুতি ভাষায় প্রকাশ করা বড় কঠিন। আমি নিজের কবর থেকে উঠে এসেছি। যুদ্ধের সময় মানুষের মৃত্যু আমার কোলে হয়েছে। আমি মৃত্যুর আগে আমার সহযোদ্ধার মুখে পানি তুলে দিয়েছি। তাঁদের চোখগুলো জ্বলজ্বল করে ভাসে।'

এসব বলতে বলতে অস্থির হয়ে যান তিনি। চোখ তাঁর পানিতে ভরে ওঠে।

যুদ্ধ শেষে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন তিনি। লাশ কাটা ঘরে গেলেই মনটা অস্থির হয়ে যেত তাঁর। অনেক স্মৃতি মানুষ ভুলে যায়। কিন্তু ওখানে গেলেই অনেক স্মৃতি ফিরে আসতো তাঁর। একটা অস্থিরতা তাঁকে তাড়া করে বেরায় সব সময়। মেডিকেল কলেজ শেষ করে অনেক কিছু করতে চাইলেন দেশে। বালির বাঁধের মতো একে একে ভেঙ্গে গেল সব। একটি বিশাল হতাশার

মাঝে দেশ ছাড়লেন তিনি। চলে গেলেন মধ্য প্রাচ্যে। ছ'মাস পরেই চলে এলেন আমেরিকাতে। তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবনে ইতিহাস কষ্ট-দুঃখ-আনন্দে ভরা। জীবনের দুঃসময়ে ভেঙ্গে না পড়ে, তা কিভাবে কাটিয়ে ওঠা যায় তাঁর জীবন্ত সাক্ষী ডাঃ সুলতান সালাহ্ উদ্দিন আহমেদ।

ফ্লোরিডার মায়ামিতে একমাত্র মেয়ে জেসমিন আর স্ত্রীকে নিয়ে থাকেন তিনি। নোভা সাউথ ইষ্টার্ন ইউনিভার্সিটি আর মায়ামি ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করেন তিনি। মানব সেবার ব্রত নিয়ে দেশে বিদেশে ছুটে বেড়ান। কখনও ছুটে যান হাইতিতে, কখনও বাংলাদেশের আনাচে কানাচে। বুক তাঁর বাংলাদেশের হৃদয়। 'হাপ ফাউন্ডেশন' নামের এক মহৎ প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হয়ে দেশের জন্য অবিরাম কাজ করে যাচ্ছেন তিনি।

সুলতান সাহেব মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন, যে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে গিয়েছিলেন তিনি, যে জন্য ফিরে এসেছেন তিনি কবর থেকে, সে স্বাধীনতা আসবে যখন মানুষ মুক্তি পাবে ক্ষুধা-রোগ-জরা-অনাচার-অত্যাচার থেকে। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম,

'জীবন সুতোর টানে কেথায় যাবেন তিনি?'

ধীরে ধীরে তিনি বললেন:

'সবই পেয়েছি ছোট এ জীবনে। তারপরেও সব কিছু ছাপিয়ে চোখের সামনে ভাসে আমার প্রিয় দেশ। আমার বাংলাদেশ। আমি ভাবি, কোন এক সুতোর টানে আমি ছুটে চলেছি। কিন্তু তারপরও পেছন থেকে কে যেন আমাকে ডাকে। মনের গহিনে কে যেন গেয়ে ওঠে–

"কোন দিন আসিবেন বন্ধু
কয়া যাও, কয়া যাও রে!"

একজন অড্রের গল্প

এক যুগ আগে এ শহরে আসার পরপরই অড্রের সাথে পরিচয়।

বব মারলির দেশে জন্ম তার। বাবা মার সাথে এদেশে এসেছে তিন বছর বয়সে। নিউইয়র্কে বড় হয়ে ওঠা অড্রের মাঝে পদে পদে আমি ব্রুকলিনের স্মৃতি খুঁজে পাই। কঠিন কোমলে মেশানো এক অনন্য মানবী এ অড্রে।

জীবনের অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে সেবিকার পেশা বেছে নিয়েছিল বত্রিশ বছর আগে। কেবল সামনে এগিয়েছে অড্রে। বর্ণ বৈষম্যের অদৃশ্য রেখা তাকে স্পর্শ করেছে বহুবার, জীবন এঁকেবেঁকে গেছে বহুবার। কিন্তু গন্তব্যের পথ হারায়নি এ অড্রে।

সেবিকাদের বড় এক কর্মকর্তা হয়েও অড্রে গত এক যুগে আমাদের ফ্লোরিডা অংঙ্গরাজ্যের একটি অনন্য পরিপাকতন্ত্র বিভাগ গড়তে আমাদের পাশে দাড়িয়েছে সবসময়।

এখনও প্রতিদিন ভোরে অড্রে আমার নিজের বোনের মতো খবর নেবে নাস্তা সেরে এসেছি কিনা। নতুবা নিজেই ক্যাফেতে গেয়ে বাবুর্চীর পাশে দাঁড়িয়ে নাস্তা বানিয়ে নিয়ে আসবে। যেমনটি হলো আজ। সাথে করে নিয়ে এসেছে জ্যামাইকা থেকে আনা অনন্য এক পেঁপের চাটনি।

গত মাসে আমাদের বিভাগটি আমাদের সবগুলো হাসপাতালের মাঝে সেরা পুরস্কার পেয়েছে। সাংবাদিক সাহেবরা এসেছেন ছবি তুলতে। পত্রিকার প্রচ্ছদের জন্য। আমি অড্রের ছবি তুলতে বললাম। ও সেই ছবি দেখে কেঁদে ফেলেছে। আনন্দের কান্না।

অড্রেরাই তো আমাদের মতো চিকিৎসকদের আলোকিত করে।

আমি জানি, অনেক অড্রের গল্প ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সব হাসপাতালের আনাচে কানাচেতে।

আর্নল্ড পামারের গল্প

বসন্তের ছুটি শুরু হয়েছে অরলান্ডোতে। শীতের ছোঁয়া শেষ হয়নি এখনো। সকালে শীতের আমেজ দিয়েই শুরু আজকের দিনের।

আমি অরলান্ডোর যে শহরতলীতে থাকি তার নাম 'বে হিল'। এ এলাকার চারপাশে লেকের ছড়াছড়ি। এর মাঝেই বিখ্যাত 'বে হিল গলফ কোর্স'। খানিকটা পাহাড়ি অসমতল এলাকাতে চিরসবুজ পাইন-ওক-সাইপ্রাসের ছড়াছড়ি। তার পাশঘেঁষে লেকগুলো। আকাশের নীলকে বুকে ধারণ করে রাখে তারা। সাইপ্রাসের সবচে উঁচু ডালে অস্প্রি ঈগল বসে থাকে নির্ভয়ে।

আমি গল্ফের পাগল নই। তার পরও বসবাসের জন্য 'বে হিল' বেছে নিয়েছি কেবল অসামান্য প্রকৃতিকে উপভোগ করবার জন্য। এমনটি করেছিলেন আর্নল্ড পামার প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে।

আর্নল্ড পামার হলেন গলফের রাজপুত্র, রাজা সবই। জন্মেছিলেন ফিলাদেলফিয়ার ছোট একটি শহরের নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে। বাবা সে শহরের গলফ কোর্সে কাজ করতেন। সে থেকেই তাঁর গলফে হাতেখড়ি। সে সময় গলফ ছিল কেবল বিত্তবানদের খেলা।

পামার সাহেব তাঁর অসাধারণ মেধা, পরিশীলিত ব্যাবহার, মানবিক গুণ দিয়ে জিতে নেন সব মানুষের মন, দেশ-বিদেশের বড় বড় সব টুর্নামেন্টের ট্রফি। হয়ে যান একজন জীবন্ত কিংবদন্তী। তিনি অরলান্ডোকে বেছে নেন তাঁর প্রিয় শহর হিসেবে। 'বে হিলে' তৈরি করেন তাঁর সেরা গলফ কোর্স। সে কোর্সের চারদিকে তৈরি চমৎকার সব বাড়ি। তার একটিকে তিনি বেছে নেন। আরও অনেক বরেণ্য খেলোয়াড় তার সান্নিধ্য পাবার জন্য এখানে তাদের বাড়ি তৈরি করে নেন।

পৃথিবীর প্রায় সব কটি উপমহাদেশে তিনি তৈরি করেছেন অনেক গলফ কোর্স। খেলাটিকে জনপ্রিয় করেছেন। মধ্যবিত্ত এমনকি নিম্নবিত্তের মানুষরাও আজ এখানে গলফ খেলতে পারে।

তাঁর প্রায় পঞ্চাশ বছরের স্ত্রী, উইনি যখন দূরারোগ্য কান্সারে মারা গেলেন, তখন তিনি অনুভব করলেন যে অরলান্ডোতে মহিলাদের জন্য, শিশুদের জন্য আলাদা হাসপাতাল দরকার। তিনি তখন তৈরি করলেন 'উইনি পামার মহিলা হাসপাতাল' আর 'আর্নল্ড ও উইনি পামার শিশু হাসপাতাল'। তিনি তৈরি করলেন 'আর্নল্ড আর্মি', যাদের কাজ হলো এ ধরনের ভালো কাজে তাঁকে সাহায্য করা।

সারা জীবন তিনি কাটিয়েছেন এসব অসাধারণ কাজ করে। দু'বছর আগে তিনি চলে গেছেন পরলোকে। গত ত্রিশ বছর ধরে অরলান্ডোর একটি প্রধান আকর্ষণ হলো 'আর্নল্ড পামার পি জি এ টুর্নামেন্ট'। সারা দুনিয়ার সেরা

গলফ খেলোয়াড়রা আসে এখানে। আমাদের শহরতলি যেন এক সপ্তার জন্য হয়ে যায় সারা পৃথিবীর গলফ প্রেমীদের রাজধানী।

আজ টুরনামেন্টের শেষ দিন। টাইগার উড জিততে পারলেন না এবার। মাকেলরয় এগিয়ে আছে এ প্রতিযোগিতায়। চারদিকে আর্নল্ড আর্মিদের বিশাল তৎপরতা, মানবতার সেবায় সবাইকে সাথে নেবার।

চার বছর আগে আমার ছেলেমেয়েকে আমাদের প্রতিবেশী আর্নল্ড পামারকে দেখাবার জন্য নিয়ে গিয়েছিলাম। অসাধারণ তাঁর ব্যাবহার। ফেরার সময় পকেট থেকে 'আর্নল্ড আর্মির' কার্ডটা বের করে বললেন,

'ডাক্তার, আমাদের সাথে চলে আসো।'

আমি সে সম্মান মাথা পেতে নিলাম।

এখনো উৎসাহের সাথে সে কাজটা করে যাচ্ছি।

অপ্রয়জনীয় জিনিস

বারাকাত সাহেব চুপচাপ বসে আছেন ঘরের এক কোণায়। তাঁর মনটা খুব একটা ভালো নেই। নতুন বাসায় আজ তাঁর এক সপ্তাহ হলো। এদিনে সাধারণত সাতই মার্চের ভাষণ শোনা তাঁর একটি পুরনো অভ্যাস। কিন্তু তাঁর চিরপরিচিত সিডি প্লেয়ারটি তাঁর নতুন বাসাতে নেই। ওগুলো এখন বাক্স বন্দি।

সাত বছর আগে বারাকাত সাহেব অরলান্ডোতে আসেন। টেনেসির বিশাল লেকের ওপর প্রাসাদোপম বাড়ি ছেড়ে অরলান্ডোতে বেশ কষ্ট হচ্ছিলো তাঁর। স্ত্রী মারা যাবার পর অতি প্রিয় বাড়িটিও তাঁর কাছে কষ্টের হয়ে গেল। যে বাড়িতে লোক জন গমগম করতো। প্রতি সপ্তায় লেগে থাকতো বড় বড় সব দাওয়াত, সে বাড়ি জনশূন্য হয়ে গেল।

বাংলাদেশ আর ভারত থেকে অনেক নামি দামি শিল্পী তাঁর বাসায় আসতেন। মানুষ ভেঙ্গে পড়তো তাঁর বাড়িতে। যখন সে সব মধু ফুরিয়ে গেল, মধুর মাছিও হারিয়ে গেল। যখন তাঁর এক মাত্র ছেলে জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন চিকিৎসক হিসেবে কাজ নিলেন, তখন তিনি তাঁর ভাগ্নের আমন্ত্রণে অরলান্ডোতে একটি ছোট বাড়ি কিনে এখানে চলে এলেন।

বিশাল লেকের ওপর বাড়ি। বাড়ির পেছনে বিশাল দু'টো ওক গাছ। ওকের ছায়াতে তাঁর বসার জায়গা। একটা দোলনা। দু'টো চেয়ার তার পাশে। ওখানে বসে লেকের দিকে চেয়ে সব পুরনো দিনের স্মৃতি খুঁজে বেড়াতেন তিনি।

আমার সাথে দেখা হয় কালে ভদ্রে। ক'মাস আগে আমাদের বাসায় বেড়াতে এলেন। বললেন,

'আজ কাল হাঁটতে কষ্ট হয়। অনেক কিছু ভুলে যাই। ভাবছি 'এ এল এফ' (Adult Living Facility) এ চলে যাবো।'

'এ এল এফ' হলো নার্সিং হোমের উন্নত সংস্করণ। এক রুমের ছোট বাড়ি। এক চিলতে বসার ঘর, একটা সোফা পাতা তাতে। একটা টেলিভিশন, ইন্টার নেট লাগানো আছে। অপরিহার্য জিনিস ছাড়া বাহুল্য কিছু রাখার জায়গা নেই সেখানে। আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম,

'আপনার প্রিয় বইগুলোর কি হবে?'

উনি হেসে বললেন, 'তোমার বাসায় জায়গা থাকলে তুমি নিতে পারো ওগুলো।'

গত পরশু বারাকাত সাহেব জানালেন যে তিনি অরলান্ডোর কাছাকাছি একটি সুন্দর 'এ এল এফ' এ চলে এসেছেন। তারা তাঁর সব অপ্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র একটি গুদামে রেখে দিয়েছে। তিনি বললেন,

'তোমার যা যা পছন্দের এসে নিয়ে যেও ওখান থেকে।'

আমি হেসে বললাম, 'আমার ঘরে তো জায়গা নেই। তবে কাল আসবো আপনার সাথে দেখা করতে।'

বারাকাত সাহেবের খাবার দাবারে তেমন কোন সমস্যা নেই। তাঁকে একটি বৈদ্যুতিক গাড়ি দেয়া হয়েছে। তিনি ঘুরে ফিরে বেড়াতে পারেন। একজন সেবিকা এসে দিনে তিনবার তাঁর দেখভাল করে যায়। তাঁর ছেলে দিনে দু'বার ফোন করেন। আজও তাঁর ছেলেকে বিয়ে করবার জন্য তাগিদ দিয়েছেন তিনি।

এজন্য মনটা খারাপ তাঁর। মুন্নি বেগম, তাঁর স্ত্রী মারা যাবার আগে বলেছিলেন,

'আমি তো পারলাম না বিয়ে থা করাতে ওকে, দেখ তুমি কিছু করতে পারো কিনা।'

মুন্নি বেগমের কথা বোধ হয় রাখতে পারবেন না তিনি।

যাবার সময় আমাকে বারাকাত সাহেব বললেন,

'দেখো, সারাজীবন বোধহয় কেবল অপ্রয়োজনীয় জিনিসই করলাম, আর অপ্রয়োজনীয় জিনিসই কিনলাম। আমার ঘর তো কেবল ছোটই হচ্ছে দিন দিন!'

অরলান্ডোর আলো ঝলমল রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে ঘরে ফেরার পথে মনে হলো কতো অপ্রয়োজনীয় জিনিসে–ই না রাঙ্গানো আমাদের জীবন। আমার গাড়ি ছুটে চলছে। আমি আমার জীবনের অপ্রয়োজনীয় জিনিসের সমীকরণ মেলাতে পারছি না।

ছবিঘর

আমাদের বাসা থেকে একটি বাসা পরেই শুরু হয় 'উইন্ডারমেয়ার' নামের শহরতলি। এটি অরলান্ডোর অংশ হলেও সে এলাকার লোকজন এটিকে 'উইন্ডারমেয়ার গ্রাম' বলেন। জায়গাটা খানিকটা গ্রামের মতোই। চারদিকে লেক। শতবর্ষী ওকের সারি। কাঁচা মাটির রাস্তা এখানে সেখানে। এ শহরতলির প্রধান সড়ক একটি। এখানে বাস করেন প্রকৃতি প্রেমিক শিল্প-পিয়াসু অনেকেই। তাদের সাথে অনেক নামকরা তারকারাও।

উইন্ডারমেয়ার শহরতলির প্রধান সড়কের কোল ঘেঁষে রয়েছে কিছু কফি আর আইসক্রিম খাবার দোকান, ছোটখাটো রেস্তোরাঁ, পুরনো ছবি, আসবাব-পত্র সংগ্রহের দোকান, আর্ট গ্যালারি আর একটি 'ছবিঘর'। বাইরে নাম টাঙানো আছে 'The Art Room'। আমি নাম দিয়েছি 'ছবিঘর'।

আমি ছবিঘরের ভেতরে কোনদিন ঢুকিনি। তবে বাইরে থেকে দেখি শিশু কিশোর, এমনকি বড়রাও ছবি আঁকছে। আমার ওখানে ঢোকার খুব ইচ্ছে। প্রতি বছর এ ছবিঘরের পাশেই বসে শিল্পী আর শিল্প-পিয়াসু মানুষদের মেলা। দেশ-বিদেশের শিল্পীরা তাদের আঁকা ছবি, ভাস্কর্য নিয়ে আসেন। খোলা মাঠে ওক গাছের ছায়ায় বসে ছোট ছোট দোকান। শিল্পীরা বসে থাকে। কফি হাতে আড্ডা চলে তাদের ঘিরে। বোহেমিয়ান কিছু শিল্পী এদিকে সেদিকে গান করেন। চমৎকার একটি পরিবেশ।

আজ ছিল সেই দিনটি। চমৎকার বসন্তের দিন। না গরম, না ঠান্ডা। আমরা হেঁটেই চলে এসেছি। কিছু শিশু-কিশোর তাজা লেবুর সরবত বানিয়ে বিক্রি করছে। ওদের সরবত খেতে খেতে জানলাম তারা এ বিক্রির পুরো টাকাটা ইথিওপিয়ার একটি গ্রামে শিশুদের 'ছবিঘরের' জন্য দান করবে।

আমরা সময় নিয়ে বিভিন্ন শিল্পীদের কাজ দেখছি। অভিভুত হয়ে যাচ্ছি। শিল্পীদের সাথে কথা বলে খুব ভালো লাগলো। এখানে এলে দু'একটা শিল্পকর্ম কেনা হয়। তবে প্রতিবারই আমার গিন্নি আমাকে মনে করিয়ে দেয় এসব ঘরে রাখবে কোথায়? কথাটা ঠিক।

ছবি দেখা আর ঘোরা ফেরার মাঝে খিদে পেয়ে গেল। মেলার এক পাশে অনেকগুলো খাবারের গাড়ি। এ গাড়িগুলো হলো পুরোদস্তুর রেস্তোরাঁর রান্নাঘর। এরা একেবারে সদ্য বানানো গরম খাবার পরিবেশন করে। মরক্কান কেফতা, পেরুর সেভিচে, আর্জেন্টিনার এম্পানাদা, ইতালির পিঁজা, জার্মানির বার্গার, জাপানের সুশি, টার্কির কেবাপ, আমাদের সমুচা সবই আছে। কেবল চটপটি ফুচকাটা নেই।

সব দেখা শেষ করে 'ছবিঘরে' ঢুকলাম। ছবিঘরের উঠোনে জেনির সাথে পরিচয় হলো। সেখানে সেচ্ছাসেবি শিল্পীরা ছবিঘরের শিল্পীদের আঁকা ছবি

বিক্রি করছে। এর বিক্রির পুরো অর্থ মানসিক প্রতিবন্ধি শিল্পীদের জন্য তৈরি করা একটি ছবিঘরের জন্য দান করা হবে।

জেনির কাছে এ ছবিঘরের গল্প শুনলাম। এ ছবিঘরটি ক্যাম্পবেল পরিবার দান করেছেন এবং এখনও এটিকে তারা দেখভাল করেন। বিত্তশালী ক্যাম্পবেল পরিবার নিউইয়র্ক থেকে এখানে আসেন প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। তখন এ পুরো এলাকাটা ছিল কমলার বাগান। একজন সফল কমলা চাষি হিসেবে বিত্তশালী হয়ে যান জেমস ক্যাম্পবেল। তাঁর স্ত্রী কামেলা ছিলেন একজন চিত্রশিল্পী। তাদের একমাত্র সন্তান নোয়া জন্মগত ভাবে মানসিক ও শারীরিক সমস্যা ছিল। নোয়া কেবল ছবি আঁকতে পছন্দ করতো। বিশ বছরের নোয়া দুর্ঘটনাবসত বাড়ির পাশের লেকে ডুবে মারা যায়।

ক্যাম্পবেল পরিবার মুষড়ে পড়েন এ ঘটনাতে। নোয়ার ছবি আঁকার ঘরটি তারা দান করে দেন 'ছবিঘর' হিসেবে। এখানে এসে যে কেউ ছবি আঁকতে পারে। কেবল নামেমাত্র কিছু অনুদান দিতে হয়। যে কেউ ছবি আঁকা শিখতে পারে এখানে। মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সব কিছু বিনা খরচে।

ছবিঘরের ভিতরে বাইরে চমৎকার পরিবেশ। চারদিকে শতবর্ষী ওক গাছ। ছায়া আর সুনসান নীরবতা। ছবিঘরের এক কোণায় নোয়ার আঁকা কিছু ছবি। একটি ছবিতে চোখ আটকে গেলো। একটি পূর্ণিমা রাতের ছবি। ওক গাছের ডালগুলো লেকের ওপর পড়েছে। লেকের পানিতে জ্যোৎস্নার আলো জ্বলজ্বল করছে। বড় মায়াময় এক রাতের ছবি এঁকেছে নোয়া।

আমার খুব জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল, নোয়া কি এরকম একটি রাতে লেকের পানিতে নেমেছিল? আমার কানে একটি গান বাজছে সেই থেকে–

"চাঁদনি পসর রাইতে যেন আমার মরণ হয়...!"

অরলান্ডোর গাউচা

মিগেলের দিকে তাকালে মনে হবে এখনই তাঁর একটা ছবি তুলে ফেলি। মিগেলকে দেখতে কাউবয় ছবির নায়কের মত লাগে। রুক্ষ চেহারা। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কপালে আর মুখে অল্প বয়সেই বুড়ো মানুষের মত অনেক বয়সের ভাঁজ।

মাথায় সব সময়ই থাকে বাহারি কাউবয় হ্যাট। মিলিশিয়াদের মত জামা। চটে যাওয়া জিন্সের প্যান্ট। নিখুঁতভাবে বানানো তাঁর জুতো জোড়া। কাউবয় বুট। ওদের রাঞ্চেই বানানো হয় ওগুলো।

মিগেলের জন্ম আর্জেন্টিনাতে। সান লুইস নামের ছোট এক শহরের কাছে। মেন্দজা থেকে বেশ কাছে। বিশাল এক রাঞ্চে তাঁর জন্ম। ওখানেই বড় হয়েছে সে। মাইলের পর মাইল কেবল সবুজ। নীল আকাশ। অবারিত নির্মল জীবন। ছোটবেলা থেকে সে শিখেছে কেমন করে বন্য ঘোড়াগুলোকে বাগে আনতে হয়, কিভাবে গবাদি পশুগুলোকে বড় করতে হয়। তাদের রোগ-ব্যাধিতে কিভাবে তাদের সাহায্য করতে হয়।

সেই ছোটবেলা থেকে মিগেল শিখে গেছে অন্ধকার রাতে বনের মাঝে বন্ধু গাউচাদের সাথে কিভাবে আকাশের তাঁরা গুনতে হয়। বুনো 'মাটা' খেতে খেতে আর তামাক চিবেতে চিবেতে কিভাবে রাতের আঁধারে মিশে যেতে হয়।

গাউচারা হলো আর্জেন্টিনার কাউবয়। ব্রাজিলে ওদেরকে ডাকে 'কাম্পিনু', পেরুতে 'চালান' বা 'মারচুকু', ভেনিজুয়েলা আর বলিভিয়াতে বলে 'লনেয়ু, কিউবাতে 'পানিওলা'। এরা আমাদের সাধারণ মানুষের সামাজিক রীতিনীতিতে বড় হয় না। সামাজিক প্রথা বলে তেমন কিছু এদের জানা নেই।

মিগেল অনেকটা সেভাবে বড় হয়েছে। তবে মিগেল বই পড়তে শিখেছিল ছোট বেলায়। সান লুইসে যেত কেবল বই কিনবার জন্য। সাহিত্যের প্রতি তার অসামান্য আসক্তি। গাউচাদের নারী আনাসক্তি থাকলেও মিগেল ছিল ভিন্ন।

ছোটবেলাতেই মারিয়ার প্রেমে পড়ে যায় সে। মারিয়া তাদের দূরের আত্মীয়। বয়সে খানিকটা বেশি হলেও তাঁর আকর্ষণেই বন বাদাড় ছেড়ে মাঝে মধ্যে রাঞ্চে ফিরে আসতো সে।

রাজনৈতিক কারণে তাঁর পরিবার আর্জেন্টিনা ছাড়তে বাধ্য হয়। সান লুইসের এক আমেরিকান পরিব্রাজক তাঁকে ফ্লোরিডার অরলান্ডোর কাছাকাছি এক রাঞ্চে আশ্রয় দেন। তা প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা। তখন তাঁর বয়স ছিল পনের।

আস্তে আস্তে ফ্লোরিডার ভ্যাপসা গরম সয়ে গেছে তাঁর। জলাভুমি, কুমির, বুনো পামের সারি, তুমুল বৃষ্টির দিন সব তাঁর সয়ে গেছে। কেবল খোলা

আকাশ তাঁর বদলায়নি। বদলায়নি চির চেনা অন্ধকার রাতের তারা। এখাকে বন্য ঘোড়া নেই। তবে পোষা ঘোড়ার অভাব নেই। গবাদি পশুর অভাব নেই। রাঞ্চ থেকে তিরিশ মাইল দূরে অরলান্ডো শহরে আসলেই বড় বড় বইয়ের দোকান মেলে।

তবে কি যেন নেই এখানে তাঁর। গাউচাদের মুক্ত জীবনটা নেই। মারিয়া নেই।

তার বাবার জীবনের শেষ ক'টা দিনের ডাক্তার হবার কারণে মিগেলের সাথে আমার একটা সখ্য তৈরি হয়েছে। ও প্রায়ই আমাকে বলে তাঁর রাঞ্চে একটা দিন কাটাবার জন্য। আমাকে ঘোড়ায় চড়াবার লোভ দেখায় সব সময়।

আজ ওর রাঞ্চে গিয়েছিলাম। পুরো পরিবার খুব মজায় সময় কাটালাম। ঘোড়ায় চাপলাম। খুব ইচ্ছে হচ্ছিল ওর মতো কাউবয় হয়ে যাই। রাতের আঁধারে বনে বাদাড়ে মিশে যাই। পরিচিত তারাদের সাথে কথা বলি।

ফেরার সময় মিগেলকে ধন্যবাদ জানালাম। মিগেল হেসে বলল,

'এ জীবনে আর 'গাউচা' হতে পারবো না। সান লুকাসেও যাওয়া হবে না আর।'

ঘরে ফিরছি। সূর্য ডুবছে। আমার মনে হলো আমার সাথে মিগেলের বেশ মিল আছে। আমি বাংলাদেশে চিত্রা নদীর মাঝি হতে চেয়েছিলাম!

জানের সদকা

'তোমার বাবা আজ আর তোমার সাথে কথা বলতে চাচ্ছেন না। উনি বিব্রত।'

আম্মা কোন রাখ ঢাক না করেই বললেন।

আমার বাসা থেকে হাসপাতালে পৌঁছাতে প্রায় আধা ঘণ্টা লাগে। প্রতিদিন ভোরে রুটিন মাফিক তাঁদের সাথে কথা বলি। আজও কথা বলছিলাম তাঁদের সাথে। কিন্তু বাবা কথা বলবেন না। কারণ আমার বাবা বড়ই বিব্রত। কারণ তিনি 'ধরা' খেয়েছেন (আমার মায়ের ভাষায়)।

গতকাল সকালে তিনি একটি ফোন কল পেলেন। বাবু নামে একটি ছেলে তাঁকে ফোন করেছিল। বাবু বলল,

'নানা, কেমন আছেন? ভারি বিপদে পড়েছি। আমার কিছু টাকা দরকার।'

আমার বাবা বেশ হিসেবী মানুষ। এটি কোন বাবু তা তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না। তার মনে হলো এই 'বাবু' বোধ হয় আমাদের গ্রামের বাড়ির কেয়ারটেকার রফিক মিয়ার ছেলে। তিনি তাড়াহুড়ো করে কয়েক হাজার টাকা বাবুকে "বিকাশ" করে পাঠিয়ে দিলেন।

ঘরে এসে রফিক মিয়াকে জানাতেই সে চমকে উঠলো। তিনি জানালেন, বাবু তো আমার বাবার কাছে টাকাই চায়নি। আমার বাবা তো বেকুব বনে গেলেন। তিনি সেই বাবুকে ফোন করে আর খুঁজে পাচ্ছেন না এখন। কী বিব্রতকর ব্যাপার!

আমরা সবাই এক গাল হাসছি। আর আমার বাবা কেবল চুপসে যাচ্ছেন। তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য আম্মা তাঁকে বলেছেন,

'মন খারাপ করো না। ধরে নাও 'জানের সদকা' দিয়ে দিলে।'

অফিসে কাজ শুরু করেছি। হ্যারিকেন 'ইরমা' চলে যাবার পর ও রোগির পরিমান কমেনি। একের পর এক রোগি দেখছি। দিনের শেষ রোগিটা বাতিস্তা সাহেব। আশি বছরের চির তরুণ যুবক। ভীষণ স্বাধীনচেতা মানুষ। এখনও নিজের সব কাজ নিজে নিজেই করেন। বাতিস্তা সাহেবের আসার কথা ছিল ঘণ্টা খানেক আগে। দেরিতে এলেও অফিসের কেউ তাঁকে না বলতে পারে না। তার মতো এত মধুর স্বভাব খুব কম মানুষেরই আছে। প্রতিদিনই হাতে করে কিছু না কিছু নিয়ে আসেন অফিসের কর্মচারীদের জন্য। আজ তিনি কিছু নিয়ে আসেন নি।

আমাকে দেখেই তার চেয়ার ছেড়ে দাড়িয়ে গেলেন বাতিস্তা সাহেব। দেরি করে আসার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। তার পর দেরি হবার কারণটা আমাকে জানাতে শুরু করলেন। আমি আমার রোগিদের কথা মন দিয়ে শুনবার

চেষ্টা করি। সৌজন্য সহকারে তাঁর দেরিতে আসার কারণটা শুনলাম। হ্যারিকেন 'ইরমাতে' তাঁর বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাঁকে আমাদের শহরের সমাজ কল্যাণ বিভাগ ফোন করেছে আজকে। তারা তাঁকে জরুরী= ভিত্তিতে কিছু টাকা তাঁর ব্যাঙ্কের মাধ্যমে আজই 'ওয়ার' করে পাঠাতে বলেছেন। অল্প কিছু টাকার বিপরীতে তারা তাঁর বাড়ির সব কিছু মেরামত করে দেবে। তিনি ব্যাংকে গিয়ে আটকে গিয়েছিলেন। সে জন্যই তিনি আসতে দেরি করেছেন।

আমিতো শুনেই অবাক। বাতিস্তা সাহেবও তো দেখি আমার বাবার মতো 'ধরা' খেয়ে গেছেন আজকে।

আমি তাঁকে কিভাবে 'জানের সদকার' ফজিলত টা বোঝাবো?

ইরমা এবং আমরা

'তোমাকে কষ্ট করে এ দুঃসময়ে হাসপাতালে আসতে হলো। তোমার এবং তোমার পরিবারের এ অবদান আমরা কখনোই ভুলবো না।'

হাসপাতালে ঢোকার মুখেই বড়কর্তা জেফ একথা বলে আমাদের ধন্যবাদ জানালো। আমার সাথে আমার পুরো পরিবার। অভ্যর্থনা জানাতে ছুটে এলো হাসপাতালের নির্বাহী কর্মকর্তা। তিনি জানালেন আমাদের পরিবারকে থাকবার জন্য একটি কামরা দেয়া হয়েছে।

হ্যারিকেন 'ইরমা' ধেয়ে আসছে আমাদের দিকে। আসলে ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের এ চরম বিপদের দিনে এখানকার স্বাস্থ্য বিভাগ সকল জরুরি সেবাদানকারী চিকিৎসকদের হাসপাতালে থাকবার জন্য একটি নির্বাহী আদেশ দিয়েছে। আমাদের না এসে উপায় নেই। তারপরও জেফের কাজ জেফ করছে। এসব সৌজন্যের জন্য পয়সা লাগে না।

হ্যারিকেনের পুরো সময়টাই এখানে থাকতে হবে। আমার বাড়ি ছেড়ে আসতে কষ্ট হচ্ছিলো। আমার তের বছরের ছেলে বাসা থেকে বের হবার আগে পিয়ানোতে বসে খানিকটা সুর তুলল। আমার মনটা আরো ভারি হয়ে গেলো।

অথচ হাসপাতালে ঢোকার পর মনটা ভালো হয়ে গেলো। আমার পরিচিত আরো অনেক সহকর্মী চিকিৎসক তাদের পরিবার নিয়ে এসেছেন এখানে। খানিকটা উৎসব উৎসব ভাব। পেছনে সবার উৎকণ্ঠা। তবে সবাই এ সময়টা ভালোভাবে কাটাতে চান। আমাদের সব সহকর্মীদের কাজ শেষ করে ঘরে ফেরার রাশ থাকে প্রতিদিন। আমরা কেবল সৌজন্য বিতরণ করি রোজ। আজ আমাদের কাজের পর ঘরে ফেরার রেশ নেই। ঘর এখানেই।

হাসপাতালের সবার জন্য 'অসিওলা ক্যাফে' পুরো সময় খোলা থাকছে। খাবার দাবার, চা-কফি সহ সব ধরনের খাবারের ছড়াছড়ি। আমাদের জন্য আড্ডা দেবারও বিস্তর জায়গা আছে। শিশু-কিশোরদের জন্য বিনোদনের আলাদা এলাকা।

সন্ধ্যের পরপরই ঝড়ের বেগ বাড়তে থাকলো। সাথে তুমুল বৃষ্টি। সাইরেন বেজে উঠলো টর্নেডো আসছে বলে। উদ্বেগ, সংশয় আর উৎসুক মন নিয়ে জানালার বাইরে তাকাচ্ছি সবাই। আড্ডা চলছে। পাশাপাশি রোগির সেবা প্রদানও চলছে।

হাসপাতাল ভবনটি এমন ভাবে তৈরি করা হয়েছে যে, এটি সবচাইতে শক্তিশালী হ্যারিকেনেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। মাঝ রাতে হ্যারিকেনের জোর বাড়তে লাগলো। আমরা সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমাদের কামরাতে ঢুকেই দেখি মেঝে পানিতে একাকার। হ্যারিকেনের প্রবল বাতাস আর পানির ঝাঁপটা জয় করে নিয়েছে মানুষের তৈরি এ 'শক্তিশালী' ভবন। আমাদের কামরাটা ছেড়ে

দিতে হোল। আমরা হাসপাতালের এক কোণায় পুরো পরিবার একসাথে বসে আছি। অপেক্ষা করছি অন্য একটি কামরাতে যাবার জন্য।

হ্যারিকেনের গর্জন শুনছি আমরা। সবাই নীরব। আমার সহধর্মিণী নিরবতা ভেঙ্গে বলল,

'দেখ, জীবন কখন কোথায় কেমন করে আমাদের নিয়ে যায়। আমরা কেবল খেলার পুতুল।'

দেশ-বিদেশ থেকে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন অবিরাম খবর নিচ্ছেন। তারা ক্যাবল চ্যানেল দেখছেন আর আতঙ্কিত হয়ে আমদের জন্য প্রার্থনা করছেন। আমরা ভাগ্যবান।

আধো জাগা-আধো ঘুমে রাত কাটল। হ্যারিকেনের তেজ কমেছে এরই মধ্যে। ভোরের আলো ফুটবার আগেই প্রার্থনা ঘরে হাজির হলাম। আমাদের শল্য চিকিৎসক জাইদ নামাজ পড়ছে সেখানে। নামাজ শেষে ক্যাফেতে বসে চা খেতে খেতে নতুন এক মানুষকে জানলাম আজ। জাইদ জন্মেছিলো ইরাকে। তাঁর বাবার জন্ম প্যালেস্টাইনে। বাবাও ছিলেন একজন চিকিৎসক।

প্যালেস্টাইন থেকে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে এসেছিলেন ইরাকে। সেখানে তাঁর মার সাথে পরিচয়। মা ছিলেন একজন কুর্দি মুসলমান। বাবা ভাগ্যক্রমে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে এদেশে চলে আসেন। নতুবা সাদ্দাম হোসেনের 'বাথ পার্টির' হাতে তাঁকে হয়তো জীবন দিতে হতো। জাইদ সারা জীবন দেখেছে তাঁর বাবা কিভাবে প্রাণ হাতে করে এ দেশ থেকে ও দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ওর বাবার মতো তার জীবনও প্রবাহমান পাহাড়ি নদীর মতন। নেভাদার ছোট এক শহরে বড় হয়েছে সে। তারপর বোস্টন, নিউইয়র্ক হয়ে ফ্লোরিডাতে।

আমি নিরবে তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতার কথা শুনলাম। জাইদ মনে করে আমাদের কোন দেশ নেই। নেই কোন ভবিৎষত। আমরা কেবল চলছি। কেবল মুসাফিরের মতো। এসব হ্যারিকেন কেবল একটা ছোট্ট অধ্যায়। একটি উপলক্ষ।

সব রোগি দেখা শেষ করে বিকেল নাগাদ হাসপাতাল থেকে বেরিয়েছি। সারা অরলান্ডোতে কার্ফু চলছে। পথে দু'বার পুলিশের গাড়ি আটকে দিলো আমাকে। আমার পরিচয়পত্র দেখে ধন্যবাদ দিয়ে ছেড়ে দিলো আমাদের।

চেনা শহর আমার অচেনা মনে হচ্ছে। রাস্তার ওপর পড়ে আছে বড় বড় গাছের গুঁড়ি। ছোট খাট বন্যা রাস্তাজুড়ে। ট্রাফিক লাইটগুলো নিভে গেছে। হঠাৎ যেন একটি বিদ্ধস্ত যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে গেছে সুন্দর শহরটি।

আমি আমার পরিচিত রাস্তা চিনতে পারছি না। আমাদের বাসার মাইলখানেক দূরে রাস্তা পুরোপুরি বন্ধ। বিশাল গাছের গুঁড়ি। কোত্থেকে কজন দেবদূতের মতো মানুষ এসে নিমিষেই গাছটা কেটে কুটে সরিয়ে ফেলল। আমরা

কেবল ধন্যবাদ বলে বিদায় নিলাম। আমাদের বাসার সামনে বন্যা। দীঘির পানি উপচে পড়ছে। আমাদের সাজানো বাগানের অনেক গাছই উপড়ে গিয়েছে। আম, কাঁঠাল, জামরুল, কলা, সফেদা সব গাছ। দীঘির জলে পদ্মার প্লাবন এসেছে। সে প্লাবনে ভেসে গিয়েছে আমার ঘাট আর ঘাটে বাঁধা নৌকো।

আমরা বিষণ্ন হয়ে ঘরে ঢুকলাম।

আমার তের বছর বয়সের ছেলে বলে উঠলো,

'আমাদের ঘরটার কোন ক্ষতিই হয়নি।'

এই বলেই সে পিয়ানো বাজানো শুরু করলো। পিয়ানোর সুরের মূর্ছনাতে আমার সব ক্লান্তি, দুঃখ মুছে গেলো। জানালা দিয়ে দীঘির অশান্ত জলে কাল মেঘের মাঝে সূর্যের আলোর দেখা পেলাম। আমার মনটা আনন্দে ভরে গেলো।

"I will hold beauty as a shield against despair,
When my heart faints I will remember sights like these,,
Then surely there is something more than this
Sad maze of pain, bewilderment and fear__
And if thereÕs something, I can still hope on."
-Elsie Robinson

একটি বৃষ্টিভেজা সকাল

কাজে যাচ্ছি।

এ সময়ে অরলান্ডোতে বৃষ্টি হয় না। কিন্তু আজ হচ্ছে। বাংলাদেশের বর্ষাকালের মতো একঘেয়েমি বৃষ্টি।

এ রকম দিনে বিছানা ছেড়ে উঠতে মন চায় না। কেবল হালকা ঘুমের ঘোরে বৃষ্টির শব্দ শুনতে মন চায়।

প্রতিদিনের মতো আজ সকালেও বাবা মার সাথে কথা বলতে বলতে কাজে যাচ্ছি। তারা দুজনেই বহু দুরে। ঢাকায় থাকেন। বাবা প্রায় শয্যাশায়ি এখন। মা হাসপাতালে যান আসেন। কিন্তু আমরা সবাই দূরে থেকেও অনেক কাছে।

আমার বাবা-মা দিনের এসময়টা একসাথে ফোন ধরে বসে থাকেন। আমার সাথে কথা বলার অপেক্ষায় থাকেন।

গতকাল থেকে আজ তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি তাদের চারপাশে। কেবল আমার কন্যা নাবিহা হঠাৎ করে গতরাতে তার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সপ্তাহ শেষের ছুটিতে এসেছে। ওর বিশ্ববিদ্যালয়ের শহর থেকে বিমানযাত্রা কেবল আধাঘন্টার ব্যাপার। আমার বাবা শুনে মহাখুশী। তিনি আমাকে মনে করিয়ে দিলেন আমি যখন মেডিকেল কলেজ থেকে ঘরে ফিরতাম, তখন কী করতেন তারা। কী খাবার পছন্দ করতাম আমরা সেটি এখনো তার নখদর্পনে। মহিলা সমিতির মঞ্চে নতুন কোন নাটক এলে, একসাথে তা দেখতে যাবার আয়োজনের কথা শুনতে শুনতে খুব নষ্টালজিক হবার আগেই আমার মা ফোনটা নিলেন।

মা বললেন এখন কার্তিক মাস। এ সময় নড়াইলে রসের জন্য খেজুর গাছ কাটা হয়। তিনি নলিনি গুড়ের সন্দেশের কথা মনে করিয়ে দিলেন। ফিরোজা ফুপু সবসময় সেগুলো নিয়ে আসতেন ঢাকায়। মতিঝিল কলোনী হয়ে সেসব পৌঁছে যেতো আমার চট্টেশ্বরী রোডের ছাত্রাবাসে। হঠাৎ করে খুব নলিনি গুড়ের সন্দেশের লোভ হলো।

অনেক আগেই এসব লোভ সংবরণ করতে শিখে গিয়েছি।

কাজে পৌঁছে গিয়েছি এতক্ষনে। গাড়ি থেকে নামতেই বৃষ্টির ফোঁটাগুলো বাস্তবে ফিরিয়ে আনলো আমাকে। মনে পড়লো তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে নাবিহাকে নিয়ে একটা সিনেমা দেখতে যেতে হবে আজ। ওর প্রিয় টেলিভিশন সিরিয়াল 'ডাউনটন এ্যাবি' নিয়ে বানানো সিনেমা দেখতে যাবার কথা আজ।

আমার খুব ইচ্ছে হলো বৃষ্টিভেজা এরকম একটা দিনে রিক্সাতে চড়ে বেইলি রোডের 'খাবার দাবারে' একটু ঢু মেরে আজ বাবা মা ভাই বোনের সাথে মহিলা সমিতি মঞ্চে একটা নাটক দেখতে যাই।

কুকুর দিবস

শরতের ঝকঝকে দিন আজ। সপ্তা শেষে ছুটির দিন।

বাড়ির পাশে দীঘির পার ঘেঁষে কাশবন। সে রাস্তা ধরে আমাদের বাসার আশপাশের রেস্তোরাঁয় সকালের নাস্তা সারবার জন্য বেরিয়েছি। এখনো সূর্যের প্রখরতা তেমন বাড়েনি।

বেঞ্জামিন নামের একটি ফরাসি রেস্তোরাঁতে আজ যাবো। ওদের পেস্ট্রি আর কফির সাথে আমাদের দীর্ঘদিনের সখ্যতা।

আমাদের পড়শি মার্ক আমাদের সাথে যোগ হয়েছে আজ। ওর সাথে হাঁটছে মলি। মলি ওদের পোষা কুকুর। খুব শান্ত শিষ্ট স্বভাবের মলি যে কারো মন জয় করতে পারে। মার্ক বলল আজ অরলান্ডোর 'কুকুর দিবস'।

অনেক দিবসের নাম জানলেও 'কুকুর দিবসের' নাম জানা হয়নি।

শহরের কয়েক ব্লকজুড়ে বিশাল যজ্ঞ। বেঞ্জামিন রেস্তোরাঁর পাশে অনেকগুলো খাবারের গাড়ি। পেরুভিয়ান, জামাইকান, টার্কিশ, মরক্কান, দেশী, কাবুলি এবং আমেরিকান খাবার বিক্রি হচ্ছে। রাস্তাজুড়ে কয়েকশো তাবু খাটিয়ে স্টল হয়েছে। শয়ে শয়ে কুকুর প্রেমিক তাঁদের কুকুর নিয়ে এসেছে আজ।

এক বিশাল যজ্ঞ! বাস্তার মাঝে কুকুরদের জন্য ছোট ছোট পানির ট্যাব। তাতে মনের সুখে কিছু কুকুর গা ভিজিয়ে নিচ্ছে। সব স্টলের মুখ্য বিষয়বস্তু কুকুর। তাদের খাবার দাবার, তাদের পরিচর্যা, তাদের গোসল আর শ্যাম্পুর সামগ্রী, তাদের ওষুধ-পত্র, কাপড় চোপড় ইত্যাদি...ইত্যাদি।

মার্ক কথা প্রসঙ্গে বলল মলিকে তারা দত্তক নিয়েছিল। মলিকে প্রায় আধা মরা অবস্থায় কে যেন রাস্তার পাশে ছুঁড়ে ফেলে গিয়েছিল। 'পশু সংরক্ষণ বিভাগ' তাকে রাস্তার পাশ থেকে নিয়ে এসে সেবা প্রদান করেছে, তাঁর জীবন বাঁচিয়েছে। এমনই এক 'কুকুর দিবসে' তাদের স্টল থেকে মার্ক নিয়ে এসেছিল মলিকে। মলির মতো এরকম একটি কুকুর পাবার জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়।

পশু সংরক্ষণ বিভাগের স্টলের সামনে বিশাল ভিড়। ওখানে রাখা কুকুরগুলো আজ পেয়ে যাচ্ছে নতুন জীবন। নতুন ঘর। নানা জাতের কুকুর। সবগুলো কুকুরই ভদ্র। মনে হচ্ছে তারা যেন তাদের মেলা ভীষণভাবে উপভোগ করছে।

আমেরিকা জুড়ে চলছে রাজনৈতিক ক্যারিকেচার। সব ভুলে সবাই এ রোদেলা শরতের দিন তাদের প্রিয় কুকুর নিয়ে ছুটে এসেছে অন্য এক ভালবাসার আর ভাললাগার টানে। মানুষ সত্যিই বড় বিচিত্র!

শনিবারের গল্প

টানা দু'দিন ধরে সূর্যের দেখা নেই। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি। বিষণ্ন মেঘলা আকাশ। কালো–ধূসর মেঘে ছেয়ে আছে আকাশ। এ সব দিনগুলোতে মনটা পালাই পালাই করে, পুরনো দিনের ভিড়ে খুঁজে ফেরে স্মৃতির উষ্ণতা।

শীতের এ সব দিনে মা তালের পিঠা বানাতেন। বেশ কায়েদা করে তালের নমনীয় অংশটা বের করে ভোর সকালে তালের পিঠা ভাজা হতো। গরম গরম সেই পিঠার স্বাদটা তাহসিনাকে বলেই ফেললাম। পানির ধারে বসে একগাল হেসে দু'জনেই শুনতে লাগলাম রবিঠাকুরের গান–

"ওরে বৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন,
লুটেছে ওই ঝড়ে,
বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর
কাহার পায়ে পড়ে।"

এরকম দিনে মতিঝিল কলোনির বাসায় ভাইবোন জানালার পাশে বসে ক্লান্তিহীন আড্ডা জমাতাম। বাবা মা এসে যোগ হতেন তাতে প্রায় সময়ই। হুট করে বাবা উধাও হয়ে যেতেন। উদয় হতেন হাতে গরম গরম মোগলাই নিয়ে। কখন যে তিনি ফকিরাপুলে গিয়ে এসব নিয়ে আসতেন, ভাবতেই মনটা কেমন যেন হয়ে এলো।

তাহসিনা উঠে চলে গেল। আমি ডকে বসে স্মৃতির সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলাম নিচে, অনেক নিচে– পাচলাইশ এর ছাত্রাবাস... জাম্বিয়ার মাজাবুকা... নিউ ইয়র্ক...!

মেডিকেলের ছাত্রাবাসের ২৫ বি তে বসে শরিফ, রোকন, সাফায়েতদের সাথে বসে এক সাথে গান শোনা, কার কবিতাটি নান্দনিকতা ছুঁয়েছে, কাম্পাসে এর পরের প্রকাশনাটা কী হবে..., নতুন কোন রমরমা প্রেমের গুজব..., ছিল সে সব দিনের আলাপসালাপ। সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে শরিফ কখনো কখনো ভরাট গলায় প্রায় চিৎকার করে শুরু করতো কবিতা। রোকন শোনাত তার নতুন লেখা কবিতার দু'একটি লাইন–

"বাড়ি নম্বর দুঃখ, সড়ক নম্বর কষ্ট।"

এরই মাঝে তাহসিনা ফিরে এসেছে এক অবাক করা স্মৃতি নিয়ে। সেই পুরনো তাল পিঠা তার হাতে। এই বৃষ্টির মাঝে ও ছুটে গিয়েছে এশিয়ান মার্কেটে। ক্যানে ভরা ভিয়েতনামের 'পাল্ম ক্রিম' দিয়ে বানিয়েছে সেই তাল পিঠা।

"আমার বড় ইচ্ছে করে তোমার কাছে যাই,

তোমার ছায়াএ একটু বসি, পুরনো গান গাই।
তোমার জলে তৃষ্ণা মেটাই, জুড়াই দেহমন
তোমাকে দেই আমার এই মাটির সিংহাসন।"
-মহাদেব সাহা।

এমনি বরষা ছিল সেদিন...!

অরলান্ডোতে এখন ভারি চমৎকার সময়। হালকা শীতের আমেজ, সকালে কুয়াশার সাদা চাঁদোয়া। সূর্যের নেই তেমন প্রখরতা। তবে আজকের দিনটা ছিল অন্যরকম।

মেঘে ঢাকা সূর্য আজ। সকাল থেকেই গুড়ি গুড়ি ঝরছে। তার পরপরই শুরু হলো মুষলধারে। বাংলাদেশের বর্ষাকালের মতো বৃষ্টি। এ রকম দিনে ঘরে বসে থাকতে ইচ্ছে করে গুটিশুটি মেরে। নানা রঙের স্মৃতি উঁকি দিয়ে যায় মনের জানালায়।

বর্ষাকালে মা নিয়ে যেতেন নড়াইলের নানাবাড়ি। ফুলতলায় নেমে নৌকা নিতে হতো। নদি-খাল-বিল পেরিয়ে নানাবাড়ি। বিলের মাঝে যখন ঝরঝর করে আকাশ ভেঙ্গে পড়ত, নৌকার গলুইয়ে বসে অবাক চোখে তাকিয়ে দেখতাম অনিন্দ্য সুন্দর সেই বৃষ্টির মাধুরী। ধানক্ষেতের বুকে আঁছড়ে পড়া দমকা হাওয়া, নৌকার দুলুনি আর তার সাথে যোগ হতো মাঝির ভাঙ্গা গানের সুর– দয়াল রে... !

মতিঝিল কলোনিতে বৃষ্টি এলে, আমরা সবাই দল বেধে বৃষ্টির পানিতে ভিজে একাকার হতাম। হাঁটু পানিতে ফুটবল খেলার মজাই ছিল অন্যরকম।

ঢাকা কলেজের লেকচার গ্যালারির জানালাতে কোন শিক ছিল না। বৃষ্টি এলে শিকহীন সেই জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকতাম বাইরে। মনটা উদাস হয়ে যেত। ক্লাস শেষ হবার পরেও বসে থাকতাম সেই জানালার পাশে। সে সব বৃষ্টির দিন এখনও ছুপ ছুপ পা ফেলে হেঁটে বেড়ায় স্মৃতির চিলেকোঠায়।

সবচে বিষণ্ন বৃষ্টির দিনগুলো ছিল মাজাবুকা, জাম্বিয়াতে। চার বন্ধু মিলে গিয়েছিলাম জাম্বিয়াতে। আমার তিন বন্ধু থেকে আলাদা হয়ে আসতে হলো ছোট্ট এক শহর মাজাবুকাতে। ছোট হাসপাতালের বড়কর্তা হিসেবে পাহাড়ের ওপর পাঁচ রুমের এক বিশাল বাংলোতে আমি একা। বর্ষাকালে উঠেছিলাম সেই বাংলোতে। প্রতিদিন বিকেলে মুষলধারে বৃষ্টি। দূরে দেখা যেত যাম্বেযি নদীর আঁকাবাঁকা রেখা। বারান্দায় বসে বসে বিষণ্ন মনে শুনতাম রবীন্দ্র সঙ্গীত-

"বাহির হলেম কবে সে নাই মনে।
যাত্রা আমার চলার পাকে
এই পথেরই বাঁকে বাঁকে

নূতন হল প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।"

আজ এই বর্ষণ মুখর দিনে এক ধরনের অদ্ভুত অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই বিশাল দীঘির ঢেউয়ের সাথে উথাল পাথাল মন কেবল পুরনো সেই বন্ধু, পুরনো সুখ-দুঃখের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে বারবার–

"আবার যদি ইচ্ছে কর
আবার আসি ফিরে
দুঃখ সুখের- ঢেউ - খেলানো
এই সাগরের তীরে।

আবার জলে ভাসাই ভেলা,
ধুলার' পড়ে করি খেলা,
হাসির মায়া মৃগীর পিছে
ভাসি নয়ন- নীরে।"

একজন স্বপ্নদ্রষ্টা

আজ ঝকঝকে রোদ অরলান্ডোতে। আকাশে সাদা মেঘের ভেলা। মৃদুমন্দ বাতাস। এ রকম দিনে দীঘির পাড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে পারি আমি।

এরকম এক সুন্দর দিনে জেনারেল আমজাদ চৌধুরী, আমাদের প্রিয় আমজাদ আংকেল অরলান্ডোতে এসেছিলেন। আগে সামনাসামনি দেখিনি তাকে। অনেক গল্প শুনেছি তাঁর সম্পর্কে। আমি খানিকটা অজানা ভয়ে ছিলাম কেমন হবেন তিনি? সুদর্শন, লম্বা, গৌরবর্ণের মানুষটির মুখভরা হাসি দেখে মনে হলো অনেক যুগ ধরে তাঁকে চিনি আমি। মনে হলো চির পরিচিত একজন স্বজন।

মানুষকে আপন করে নেবার ক্ষমতা ছিল তাঁর অতুলনীয়।

আমি অরলান্ডোতে বসে দেশের কথা ভাবি, দেশের জন্য কিছু কাজ করার চেষ্টা করি জেনে আমদের এখানে একটি ছুটি কাঁটাতে চলে এলেন তিনি। সাথে এলেন তাঁর সহধর্মিণী, একজন অপরিসীম গুণান্বিত মানুষ।

অরলান্ডোতে থাকবার সুবাদে আমি অনেক অতিথি আপ্যায়নের সুযোগ পাই। আমার অতিথিদের কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পারি, শিখতে পারি। কিন্তু তিনি হলেন অতুলনীয়।

তিনি ছিলেন আসাধারণ একজন সাধারণ মানুষ। কখনই নিজেকে আসাধারণ ভাবতেন না তিনি। যে কারো সাথে মিশে যাবার একটা অতুলনীয় ক্ষমতা ছিল তাঁর। সেনাবাহিনীতে কাজ করার সুবাদে তাঁর জীবনে সব কিছুতেই ছিল শৃঙ্খলার ছাপ। একজন সেনাপতির মতো ছিল তাঁর দূরদৃষ্টি এবং পরিমিত ঝুঁকি নেবার সাহস।

আমার মনে আছে, এখানে আসার পরই প্রথম কথা ছিল,

'আমাকে একটা গাড়ির বন্দোবস্ত করে দিন।'

সবাইকে আপনি করে বলার একটা মজার অভ্যাস ছিল তাঁর। এমনকি নিজের স্ত্রীকেও। গাড়ি ঠিক হলো। তিনি নিজেই গাড়ি চালিয়ে সারা অরলান্ডো ঘুরে বেড়ালেন। সেই গাড়ি নিয়ে চলে গেলেন লম্বা ভ্রমণে। মায়ামি পার হয়ে 'কি ওয়েস্টে' অনেকগুলো দ্বীপে গাড়ি চালিয়ে এসে বললেন,

'আপনাদের এ অঙ্গরাজ্যটা বড় সুন্দর। এখানে বার বার আসা যায়।'

তিনি কথা রেখেছিলেন। আমাদের পরম সৌভাগ্য তাকে আমরা বেশ কবার অরলান্ডোতে পেয়েছি। আমাদের পরিবারের সবার জন্য সেটা ছিল একটি বিশাল প্রাপ্তি।

অরলান্ডোতে তাঁর প্রথমবার ভ্রমণের সময় তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন,

'দেশ সম্পর্কে তো বেশ খবর রাখেন। চিন্তা করেন। কিভাবে সময় পান?'

আমি হেসে বললাম দেশের খবরের কাগজ পড়ি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে খবর পাই। 'ভোরের কাগজ' পড়ি কিনা জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম আমার একটি প্রিয় পত্রিকা এটা। দেশের কথা বললেই তাঁর চোখ জ্বলে উঠত। বাংলাদেশ আর 'প্রাণ- আর এফ এল' নিয়ে তাঁর স্বপ্ন ছিল অপরিসীম।

সেবার দেশে ফেরার পর আমাকে নৈশভোজে ডাকলেন তিনি। খাবার টেবিলে দেখি বসে আছেন প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান সাহেব। আমি অবাক হয়ে আমজাদ চাচার দিকে তাকালাম। তিনি মুচকি মুচকি হাসছিলেন। দীর্ঘ দু'ঘণ্টা কতো কিছু নিয়ে কথা বললাম আমরা। যে কোন কিছু সম্পর্কে নির্দ্বিধায় কথা বলার একটা অসীম সাহস ছিল তাঁর। আর সেটি থাকতো সৌজন্য আর সম্মানবোধের গণ্ডির মাঝে।

কোন রাজনৈতিক আনুকূল্য লাভের আশা করতেন না কখনও তিনি। আর তাই রাজনীতি ছাড়িয়ে দেশের সেরা রাজনীতিবিদদের সাথে একসাথে বসে সত্যি কথা বলতে খুব একটা পিছপা হতেন না দেখেছি। তাঁর সুবাদে দেশের অনেক বাঘা বাঘা প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদদের সাথে তাঁর বাসায় সময় কাটাবার সুযোগ পেয়েছি অনেকবার।

দেশের মানুষের ভাগ্য বদলাবার স্বপ্ন ছিল সবসময়। আর তাই একের পর এক স্বপ্ন দেখেছেন তিনি আর সেগুলো সত্যি করেছেন। তাঁর সুযোগ্য পুত্র সানিকে তিনি তুলনা করতেন অলিম্পিকের ক্রীড়াবিদদের সাথে। তাঁর সপ্নের সাথে সানি পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বলে একগাল হাসতেন তিনি।

তাঁর রসবোধ ছিল প্রবল। রাশভারি মেজাজ নিয়ে খুব মজার মজার কথা অবলীলায় বলে যেতেন তিনি। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন একবার অরলান্ডোতে আসলেন। তিনিও সে সময় এখানে। তাঁর সাথে একসাথে নৈশভোজে যোগ দিলেন তিনি। তাঁকেও খানিকক্ষণ হাসিয়ে ছাড়লেন।

অনেকের বিয়ের ঘটকালি করতে দেখেছি তাকে আবার ভাঙ্গা বিয়ে জোড়া লাগাতে দেখেছিও। তাঁর কাছে পারিবারিক মূল্যবোধের বিষয়টা ছিল খুব মূল্যবান। জীবনের জটিলতা, কর্মব্যস্ততার পাশে অবকাশ যাপনকে বেশ গুরুত্ব দিতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন জীবনে একটি ভারসাম্য থাকা দরকার।

শিশুদের প্রতি তাঁর অপার ভালবাসা আমাদের খুব স্পর্শ করেছে। আমাদের দুই সন্তান ছিল তাঁর ভীষণ ভক্ত। তিনি বলতেন,

'শিশুদের তো শিশুদের মতো বড় হতে দিতে হবে। শিশুদের খেলতে দিতে হবে।'

আমাদের আপত্তি ছাড়াই তাঁদের প্রথম নিন্টেনডো তিনিই কিনে দিয়েছিলেন। ওদের সাথে কথা বলার সময় তিনি শিশু হয়ে যেতেন। তিনি বলতেন প্রাণ-আর এফ এলের প্রতিটি বড় বড় কারখানার পাশে তিনি স্কুল কলেজ বানাবেন। তাদের স্বাস্থ্যসেবার ব্যাবস্থা করবেন।

একবার অরলান্ডো থেকে বিশাল প্রমোদতরীতে করে ক্যারিবিয়ান দ্বীপ পুঞ্জ ঘুরে আসলেন। ঘটনাবহুল সে ভ্রমণ শেষে আমাকে বললেন,

'ক্যারিবিয়ান দ্বীপগুলোতে আমাদের অনেক কিছু করবার সুযোগ রয়েছে।'

তিনি বলতেন আমরা পৃথিবীর সবখানে বাংলাদেশের তৈরি গুনগত পণ্য পৌঁছে দেব। বাংলাদেশের মানুষের দারিদ্র্য ওতেই লাঘব হবে। তাঁর স্বপ্ন ছিল একজন মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যা যা লাগবে তার সবকিছুই তিনি তৈরি করতে পারবেন।

অসীম স্বপ্নচারী এ বড় মানুষটিকে শেষ দেখা দেখতে গিয়েছিলাম ডিউক ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে। তিনি নিশ্চিত ছিলেন সুস্থ হয়ে দেশে যাবার পর তিনি তার হাসপাতালের কাজগুলো গুছিয়ে আনবেন। পাবনাতে একটি বাতিক্রমধর্মী হাসপাতাল করবার স্বপ্ন ছিল তাঁর। সে স্বপ্ন পূর্ণ হচ্ছে।

বাংলাদেশকে ভীষণ ভালবাসতেন এ স্বপ্নদ্রষ্টা। আমাকে ভীষণভাবে আলোড়িত করেছেন তাঁর জীবনযাপন, দৃষ্টিভঙ্গ আর তাঁর দূরদর্শিতায়। মাঝে মধ্যে মনে হয় তিনি আছেন। হেঁটে বেড়াচ্ছেন আমাদের বাড়িতে। হয়তো এখনি বলবেন,

'বাংলাদশে কবে আসবেন? ডাক্তার সাহেব।'

এই রুপালী গিটার ছেড়ে

আমি তার চেয়ে বয়সে প্রায় ছ'বছর ছোট। তবুও আমাকে 'আতিক ভাই' বলে ডাকতেন। আইয়ুব বাচ্চু ছিলেন একজন অসাধারন গুণী শিল্পী। তার চেয়েও বড় ছিলো তার বদান্যতা।

আমার সাথে তার প্রথম পরিচয় ১৯৮৬ সালে। আমি তখন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ছাত্র। আমাদের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে সে সময়ের জনপ্রিয় ব্যান্ড 'সোলস' গান পরিবেশন করতে এলো। তখন থেকেই পরিচয়।

আমি তাকে বলতাম গিটারের যাদুকর। অসামান্য গুণের এ মানুষটি ছিলেন একাধারে গীতিকার, সুরকার, গায়ক আর গিটারিষ্ট। ১৯৯০ সালে সোলস থেকে সরে 'এল আর বি' নামে নতুন ব্যান্ড করলেন। চট্টগ্রামে তাদের প্রথম কনসার্ট হলো আমাদের মেডিকেল কলেজের শাহ আলম বীর উত্তম মিলনায়তনে।

আমাদের প্রজন্মের সীমা ছাড়িয়ে তিনি মোহিত করেছেন নতুন প্রজন্মকে। ১৯৯৩–তে 'এল আর বি'র প্রথম এলবামের গানগুলো এখনো মনে পড়ে। দ্বৈত এলবামে ছিল 'ঘুম ভাঙা শহরে', 'মাধবি', 'হকার', 'ঢাকার সন্ধ্যা'। এখনো গাই শেষ চিঠি কেমন অমন চিঠি হয়। এর পর 'সুখ' এ তিনি মিলন ঘটিয়েছিলেন ব্লুজ, রক আর তার স্বকীয়তাকে। 'চলো বদলে যাই', সুখ, গতকাল রাতে, সেই তুমি, রুপালী গিটারসহ সব গানগুলো ছিলো আমাদের হৃদয়জুড়ে।

সংগীতের বোদ্ধা না হয়েও আমরা বুঝেছি কিভাবে নিজস্ব গায়কীর সাথে তিনি জুড়ে দিতেন তার লব্ধ গবেষণার ফসল।

অনেক বার দেখা হয়েছে দক্ষিণ আমেরিকাতে। অরলান্ডোয় এসেছিলেন ক'বার। তার নামের আর খ্যাতির ব্যাপ্তি বাড়লেও এ অধমের নামটা মনে রাখতেন। বারবার বলেছি 'ভাইটা' বাদ দিন বাচ্চু ভাই। তিনি কেবল হাসতেন।

একবার তিনি এবং কুমার বিশ্বজিৎ এলেন একসাথে। কনসার্ট শেষে বললেন 'হাউস অফ ব্লুতে' যাবেন। ব্লুজ শুনতে শুনতে আবেগপ্রবণ হয়ে গেলেন তিনি। ব্লুজের ইতিহাস বললেন গড়গড় করে। সংগীত ছিল তার জীবন। গিটার ছিল তার জীবন।

২০১৫ তে তার 'জীবনের গল্প' শুনতে শুনতে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। জীবনবোধ আর রোমান্টিকতা তার গানগুলোকে জনপ্রিয় করেছে।

চল বদলে যাই থেকে অনিমেষ, ময়না থেকে তিন পুরুষ কেবল ভরিয়ে দেয় আমার মন। দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ঘুরে ফিরে এসেছে তার গানে। তার গাওয়া বাংলাদেশ কেবল তার একটি।

বেদনারও বহু রঙ দেখেছি তার গানে। বিরহের বহু সুর সিক্ত করেছে আমাদের হৃদয়। তারা ভরা রাত থেকে হাসতে দেখে গাইতে দেখো তার!

এত বড় মাপের একজন শিল্পী এত তাড়াতাড়ি চলে যাবেন ভাবতেই কষ্ট হচ্ছে। তার জীবনটা গল্পটা অনেকটা তার অচেনা জীবনের গানের মতো হয়ে গেল। নিজেকে কি খুব অবহেলা করলেন? খানিকটা বোহেমিয়ান ছিলেন তিনি। অনেক গানে তা জেগে উঠেছে।

অরলান্ডোর শরতের দিনগুলো ছোট হয়ে যাচ্ছে।

কাজ শেষে বাড়িতে ফিরছি। গাড়িতে বাজছে প্রিয় গানটি–

‘এই রুপালী গীটার ছেড়ে, একদিন চলে যাবো দূরে ... বহু দুরে...!’

চোখ জল ভরে আসছে। গলাটা ধরে আসছে। আগে কিন্তু এমন কিছু হয়নি। আজ রাতে আকাশের একটি তারা হয়ে যাবেন আইয়ুব বাচ্চু। আধার রাতে মিটি মিটি করে জ্বলবেন। সেই তারা ভরা রাতে হয়তো গাইবেন,

‘মানুষ বড়ো একা!’

আমাদের প্রথম বাড়ি

বাবা খুলনা নিউমার্কেটের পাশে সিডিএ আবাসিক এলাকায় একটা জায়গা নিয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল আমি লেখাপড়া শেষ করে বিলেত যাবো। বড় সড়ো একটি ডিগ্রি নিয়ে খুলনায় এসে মেডিকেল প্র্যাকটিস খুলবো। বাদশা মিয়া ডাক্তারের মতো আলিশান বাড়ি বানাবো। বাড়ির চারদিকে অনেক গাছ গাছালি থাকবে। কয়েকটা হরিণ ঘুরে বেড়াবে উঠোনজুড়ে।

বিলেতে যাবার ব্যাপারটা বোধগম্য হলেও খুলনা যাবার ব্যাপারে আমার কোন ইচ্ছেই ছিল না। জন্ম থেকে বেড়ে উঠেছি ঢাকায়। মতিঝিল কলোনিতে। কোনদিন কোথায় বাড়ি কিনবো কখনো ভাবিনি।

চট্টগ্রাম, জাম্বিয়া হয়ে নিউইয়র্কে এসে খানিকটা থিতু হলেও নিজের বাড়ির কথা ভাবিনি।

"বড়ো ডাক্তার" হবার প্রায় শেষভাগে ফ্লোরিডার অরলান্ডোতে একটি বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে প্রবন্ধ পড়তে এসেছিলাম। শহরটি মনে ধরে গেলো। ভাবলাম এ শহরেই বাঁধব বাসা।

জীবনের প্রথম বাড়িটি খুঁজে পেতে বেগ পাইনি। দেড় একর জমির ওপর বাংলো বাড়ি। লাল ইটের দেয়াল। ওপরে লাল টালির ছাদ। বাসার সামনে অর্ধগোলাকার পথের ওপর দু'টো রয়াল পাম গাছ। বাসার বাঁ দিকের জানালাজুড়ে লিচু গাছ।

বাড়ির চারদিকে আম, জাম, কলা, কাঁঠাল, আতা কমলার গাছ। বিশাল সবুজ ঘাসের লন। চারদিকে বাগানবিলাস আর কামিনীর গাছ। এক পাশে বড়ো এক গাজিবোর ওপর লতাপাতার বাহার। বাড়ির পিছনের উঠোনজুড়ে খেলার জায়গা আর তার পরেই সুইমিং পুল।

বাড়িটি আমাদের হয়ে গেলো। আমাদের প্রথম বাড়ি ।

আমাদের ছোট দু'টি সন্তানের মায়াবি শিশুকালের শুরু এখানেই। প্রতি গ্রীষ্মে আমার বাবা মা আসতেন সেখানে। স্বর্গীয় সময় কাটিয়েছি। বাড়ি থেকে দশ মিনিট হাঁটলেই দীঘির পাড়।

একদিন সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে আমরা ভেবেছিলাম বাড়িটা দীঘির পাড়ে হলে মন্দ হতো না। বাড়ির পিছনটা থাকবে দীঘির ওপর। পশ্চিম মুখী। চাইলেই প্রতিদিন দীঘির পাড়ে বসে সূর্যাস্ত দেখবো।

দেড় বছর পর সে রকম আরেকটি বাড়ি পেয়ে গেলাম। সে বাড়িতে গত আঠারো বছর আছি।

কিন্তু প্রথম বাড়ির সে মমতা আর মায়াটা ভুলতে পারি না। জীবনের প্রথম প্রেমের মতো।

রিকোর ছুরি

রিকোর চেহারা কাউবয় ছবির রুক্ষ নায়কদের মতো। আদতেও তাই।

অরলান্ডো শহর থেকে প্রায় ষাট মাইল দূরের ছোট একটি শহরে জন্ম তার। মূলত চাষাবাদ আর গবাদিপশু লালনপালন করে জীবন চলে সে শহরের সবার। স্বাস্থ্য সেবার জন্য আমাদের অফিসে আসছে সে প্রায় এক যুগ ধরে।

রিকো সাড়ে ছ'ফুট লম্বা। লম্বা চুল। পিছনে বেনী করা। হাল্ক হোগানের মতো বাহারি গোঁফ। কুমিরের চামড়ার বেল্ট আর বাহারি বুট পরে থাকে সে। তার নিজ হাতেই সে সব বানানো। রঙচটা জিন্সের সাথে লিলেনের শার্ট আর চামড়ার জ্যাকেট। সাধারণত হারলি ডেভিডসনের মোটর সাইকেল চালিয়ে বিকট শব্দ করে সে আমার অফিসে আসে।

রিকো ছোটবেলা থেকেই খানিকটা আলাদা। কৃষিকাজ বা কাউবয়দের কাজ তার ভালো লাগে না। সৃষ্টিশীল কাজে তার মহা উৎসাহ। একটা ছোট ওয়ার্কশপ করেছিল ছোটবেলায় তার বাড়ির পেছনে। সেখানে বাহারি সব কাজ করছে অনেকদিন ধরে। নিজ হাতে ছুরি বানায় সে। রয়াল ওকের হাতল থাকে তাতে। কুমিরের চামড়া কিংবা বাইসনের চামড়া দিয়ে তৈরি হয় চমৎকার খাপ। ছোটখাটো কাউবয় পিস্তলও বানাত সে। চমৎকার সব কাজ করা থাকে তাতে। মধ্যপ্রাচ্যেও সেগুলোর ভারি কদর।

রিকোর কাজের প্রচুর চাহিদা। কদরও আছে বিস্তর। কিন্তু রিকোর কাজের পরিমান সীমিত। তার জীবনের চাহিদার বাইরে বেশি কিছু আয় করবার ইচ্ছে নেই তার। ধনী হবারও কোন ইচ্ছে তার নেই।

রিকো আজ অফিসে এসেছে। ওর শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। খানিকটা কথা বলবার পরই হাউমাউ করে কান্না শুরু করলো সে। তাকে শান্তনা দেবার পরও কাঁদছে সে। এটা অবিশ্বাস্য। রিকো ভাঙবে, তবু মচকাবে না। হঠাৎ কী হলো তার!

খানিকক্ষণ পর তার কান্না থামলো। ওর একমাত্র মেয়ে তার জীবনটা ওলট পালট করে দিচ্ছে। ওর শহরের সবচেয়ে ধনী প্রভাবশালী লোকের পাল্লায় পড়েছে তার মেয়ে। লোকটি শহরের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। মাদকের ব্যাবসা করে। মেয়েটি টাকার লোভে সে লোকের পাল্লায় পড়ে যায়। আস্তে আস্তে মাদকাসক্ত। লোকটির সাথে অনৈতিক সম্পর্ক এখন। মেয়েটির স্বামী তাকে ছেড়ে চলে গেছে টেনেসিতে।

ছয় বছরের একমাত্র নাতিটিকে তার বাবা সাথে করে নিয়ে গিয়েছে গত সপ্তায়। মেয়েটির সাথে কথা বলে না সে। মেয়েটি মাঝে মধ্যে বাবার সাথে দেখা করতে এলে রিকো ঘর ছেড়ে বাইরে চলে যায়।

মেয়েটিকে নিয়ে পরিচিত শহর ছেড়ে দূরে কোথাও পালিয়ে যেতে চায় রিকো। কিন্তু পারে না।

রিকো কাঁদতে কাঁদতে বললো,

'ডাক্তার, সারা জীবন এতো নিখুঁত সৃষ্টিশীল সব ছুরি বানালাম। অথচ দেখ জীবনটা কেমন ধারহীন অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেল।'

রিকো তার বানানো শেষ ছুটিটা নিয়ে এসেছে। আমাকে বললো,

'রেখে দাও এটি। আর ছুরি বানাবো না এ জীবনে। টেনেসি চলে যাচ্ছি। মেয়েটিকে তো ফিরে পাবো না আর। নাতির কাছাকাছি খাকতে চাই জীবনের বাকি ক'টা দিন।'

অবসরের চিন্তা

তাঁকে সবাই জন নামে ডাকে।

প্রথম পরিচয়ের সময় আমি তাকে মিস্টার কর্নেলিয়াস বলতেই আমাকে শুধরে দিয়ে বললো, ডাক্তার, আমাকে 'জন' নামে ডাকবে।

জনের বয়স এখন সত্তর পার হয়ে গিয়েছে।

প্রায় সতেরো বছর আগে জনের সাথে আমার পরিচয়। আমাদের হাসপাতালের রেডিওলোজি বিভাগের প্রধান টেকনিশিয়ান ছিল সে তখন। তার চেহারার সাথে ছিল প্রিয় ফুটবল খেলোয়াড় পেলের অনেক মিল। তাকে সে কথা বলতেই সে হেসে বলেছিল আমি তা জানি।

আমার সামনেই জন অবসরে গেল পঁয়ষট্টি বছর বয়সে।

জন একজন অসামান্য মানুষ। ওর জন্ম হয়েছিল ত্রিনিদাদে। ওর দাদাকে ব্রিটিশরা কৃষিকাজের জন্য শ্রমিক হিসেবে এনেছিল ভারতবর্ষ থেকে। আর তার দাদির পরিবার এসেছিল দাস হিসেবে আফ্রিকা থেকে। ত্রিনিদাদ স্বাধীন হবার পর মুক্ত জীবনের স্বাদ পেলো সে। পড়াশুনাতে খুব একটা মনোযোগ ছিল না তাঁর। স্কুল পালিয়ে আমেরিকার মোটোরোলা কোম্পানির টেলিফোনের টাওয়ার বানানোর কাজে লেগে গেল সে পনেরো বছর বয়সে। ক'মাসের মাঝেই কিনে ফেললো একটি ক্যামেরা। ছোটবেলা থেকেই ছবি তোলার শখ তার।

ছোটোবেলা থেকেই প্রচণ্ড পরিশ্রমী জন।

মোটোরোলাতে কাজ করতে করতে সুযোগ হলো খোদ আমেরিকাতে এসে কাজ করাবার। মাত্র উনিশ বছর বয়সে একাই এ দেশে চলে আসলো জন। তারপর আর থেমে থাকেনি সে। কাজের পাশাপাশি পড়াশুনাও শুরু করলো। রেডিওলোজি টেকনিশিয়ান হিসেবে কাজ শুরু করলো।

পাশাপাশি ফটোগ্রাফি আর ক্যামেরার দোকান দিয়ে বসলো। বিকেল হলে কাজ শেষে সেই দোকানে বসে বন্ধুদের সাথে আড্ডা মারা ছিল তার নিত্যদিনের কাজ। সেই দোকানের ম্যানেজার নীতার সাথেই যুগল জীবনের শুরু তাঁর। নীতার জন্ম গায়ানাতে। বাবা মা দু'জনেই ভারতীয় বংশোদ্ভূত। এক মাত্র মেয়ে লিয়া একজন নার্স।

জন অবসরে যাবার একবছর পরেই জরায়ুর ক্যান্সারে নীতা ওকে ছেড়ে চিরকালের জন্য চলে গেল ওপাড়ে। জনের খুব কষ্টের সময় ছিল সেটি।

আমার দীর্ঘদিনের রোগি হিসেবে তাঁর সাথে আমার বেশ অন্তরঙ্গতা তৈরি হয়েছিল। মাঝে মাঝে ও আমার কাছে আসতো কেবল সুখ-দুঃখের আলাপ করবার জন্য।

হঠাৎ করে একদিন এসে ও জানালো খুব শিগগিরই ও কোস্টারিকাতে চলে যাবে। অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সেই দেশে সে তার অবসর জীবনের বাকিটুকু শেষ করবার পরিকল্পনা করে ফেলেছে। ও জানালো ওর প্রতিবেশী কোস্টারিকাতে অবসর জীবন যাপন করছে। ওখানে নাকি জীবনযাত্রার মান ভালো এবং খরচ কম। চিকিৎসা সেবার মান ও নাকি ভালো।

দু'বছর পর সে দেখা করতে এলো আমার সাথে। অলিভো নামের সুদর্শনা এক কোস্টারিকান তরুণীকে নিয়ে এসেছে তার সাথে। ওর বান্ধবী। জানালো খুব ভালো সে। জনের চোখে মুখে তারুণ্যের দীপ্তি। খুব ভালো লাগলো তাকে দেখে। লিয়াকে তাদের অরলান্ডোর বাড়িটা দিয়ে দিয়েছে সে।

আজ সকালে জন এসেছে আবার। গত কয়েক বছর তাকে দেখিনি। জানলাম কোস্টারিকা ছেড়ে পানামাতে অবসর জীবন কাটাচ্ছে সে। কোস্টারিকায় অনেক আমেরিকান অবসর জীবন কাটাবার জন্য বাড়িঘর কিনেছে। সেখানে জীবনযাত্রার খরচ বেড়েছে এবং মান কমেছে।

জিজ্ঞেস করলাম অলিভো কোথায়? ও জানালো পানামাতে তার সাথে চলে এসেছে। বাড়িঘর দেখাশুনা করছে। ওদের বিয়ে থা হয়নি। একসাথেই আছে তারা। সব সময় ভ্রমণ করে আর ছবি তুলে বেড়ায়। বিস্তর ছবি দেখালো এবারও।

জীবনটা উপভোগ করছে সে। জন স্বাস্থ্যের ব্যাপারে বরাবরই ভীষণ যত্নশীল। এখনো নিয়মিত ব্যায়াম করে সে। খাওয়া দাওয়া খুব পরিমিত। মজা করে বলে,

'ডাক্তার, আমার জন্য খাবারের পরিমাণ বিধাতা ঠিক করে রেখেছেন। অল্পঅল্প করে খাচ্ছি বেশিদিন বাঁচবার জন্য। হা হা হা।'

করোনা ভাইরাস নিয়ে খুব একটা মাথা ব্যাথা দেখিনি জনের। বরাবরই সাবধানী মানুষ সে। যাবার বেলায় আমাকে সবসময়ই বলে,

'ডাক্তার, অবসর যাপনের জন্য কিন্তু শরীরটা ভালো রাখতে হবে। নতুবা অবসর জীবনটা হয়ে যাবে একটা বোঝা।'

জনের কথা ভাবছি। জনকে দেখলেই অবসরটা আগেভাগে নেয়ার একটা তাগিদ অনুভব করি ।

জীবনের ছোট বড়

মিসেস নেহা চুপচাপ বসে আসেন। দিনের শেষ রোগি। তার হাত আলতো করে ধরে আছে অমল মেহতার হাত। সাধারণত আমার সামনে তারা

হাত ধরাধরি করে বসেন না। আজ বসেছেন। জনাব মেহতা বসে আছেন তার হুইল চেয়ারে।

মেহতা সাহেবের বয়স আটাত্তর কী আশি ছুঁই ছুঁই। এখনো মাথায় অনেক চুল। তবে সব ধবধবে সাদা। খানিকটা ক্লান্তি তার চোখেমুখে। সব সময়ই পরিপাটি করে পোশাক পরে আসেন এ দম্পতি। আজও তার ব্যাতিক্রম হয়নি।

গত এক বছরে মেহতা সাহেবের শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হয়েছে। স্মৃতিশক্তিও কমেছে একইভাবে। এখন তিনি আপনজনকে চিনতে পারেন না। আমাকেও চিনতে পারেন না। মাঝে মধ্যে প্রলাপ বকেন। আজকাল প্রায়ই ভুলে যান নিজের বাড়িতে আছেন। নিজের বাড়িতে বসেই আজকাল তিনি নিজের বাড়ি খুঁজতে বের হয়ে যেতে চান।

মিসেস নেহা তার পরিচর্যা করতে করতে ক্লান্ত। তাদের দু'জন সন্তানই চিকিৎসক। দু'জনেই খুব বিখ্যাত দু'টো মেডিকেল ইনষ্টিটিউশনে কাজ করছেন। একজন নিউইয়র্ক, আর একজন বোষ্টনে। তার সন্তানরা প্রায়ই এখানে আসেন। কিন্তু কোভিড অতিমারির কারণে আজকাল চাইলেও সেভাবে আসতে পারেন না তারা।

মিসেস নেহা কোভিড ইনফেকশনের ভয়ে আজকাল কোন নার্স বা তাদের পরিচর্যাকারিদের ঘরে ডাকেন না। কিন্তু আজকাল তিনি খুব ক্লান্ত। দীর্ঘদিন ধরে অরলান্ডোর চমৎকার এক লোকালয়ে বসবাস করছেন তারা। দু'জন সন্তানকে নিয়ে বড় এই বাড়িতে তারা আছেন গত চার দশক ধরে। বাড়ির চারদিকে শখ করে অনেক ফলের গাছ লাগিয়েছেন তারা। প্রতিবেশীরা হয়ে গেছেন পরমাত্মীয়। কিন্তু আজকাল তাদের দেখেন না তারা।

এই প্রথম মিসেস নেহা খুব শঙ্কিত। তিনি আর পারছেন না। আজকাল অমল মেহতার দিকে তাকিয়ে তিনি অসহায় বোধ করেন। প্রাণে ভরপুর এই ডাকসাইটে সার্জনকে তিনি খোঁজেন। কিন্তু খুঁজে পান না।

এখন তিনি খুব গভীরভাবে চিন্তা করছেন একটি দীর্ঘমেয়াদী কেয়ার হোমে চলে যাবার জন্য। বাসার কাছে লেকের ওপর একটি একরুমের কেয়ার হোম খুঁজে পেয়েছেন তিনি। এক চিলতে বারান্দা আছে। নার্স, সাহায্যকারী সবাই আছে ওখানে। রান্না বান্নার ঝামেলা নেই। ডাক্তাররাও আসবে তাদের সেখানে দেখতে।

আমার মতামত চাইতে এসেছেন তিনি। আমি খুব অস্থির বোধ করছি। কী বলবো ভেবে পাচ্ছি না। এমন পরিস্থিতে কী বলা যায় আসলে!

জীবন বড় হতে হতে আবার ছোট হয়ে যায়।

সব প্রাপ্তিগুলো অচল হয়ে যায়। একসময় সব শূন্যে মিলিয়ে যায়! এই তো মানব জীবন!

অধ্যাপক মার্শাল এবং একটি অনুপ্রেরণার গল্প

ডিসেম্বরের সেই শুক্রবারে সকাল থেকেই খুব তুষারপাত হচ্ছিলো নিউইয়র্কে।

আমি সকাল সকাল সাবওয়ে ট্রেনে চেপে ব্রুকলিনের ইউনিভার্সিটি হাসপাতালের দিকে রওনা হলাম। আমার গন্তব্য অধ্যাপক মার্শালের অফিস। আমি সেখানে একটি রিসার্চ করবার জন্য আবেদন করেছি। তিনি আমাকে দুপুর বারোটায় আসতে বলেছেন। আমাকে ইন্টারভিউ করবেন।

১৯৯৫ সালের কথা।

নিউইয়র্কে নতুন এসেছি। আফ্রিকা থেকে ভালো কাজ ফেলে উচ্চশিক্ষার আশায় আমেরিকার পথে পা বাড়িয়েছি।

আমেরিকার লাইসেন্স পরীক্ষায় পাশ করতে হবে আগে, তারপর রেসিডেন্সি ট্রেনিংয়ের জন্য আবেদন করতে হবে। এ সময়টাতে যদি প্রস্তুতির পাশাপাশি কোন আমেরিকান হাসপাতালে একটা এটাচমেন্ট পাওয়া যায় এবং ভালো একজন ডাক্তারের রেফারেন্স পাওয়া যায় তবে রেসিডেন্সি পেতে সুবিধে হয়। আর সে জন্যই অধ্যাপক মার্শালের হাসপাতালে আসা।

ব্রুকলিনের সাবওয়ে স্টেশনে নেমে দেখি হাঁটু নাগাদ বরফ জমে গিয়েছে। সেই ঠান্ডা বরফ ভেঙে প্রায় ঘন্টাখানেক হেঁটে তাঁর অফিসে পৌঁছালাম। অধ্যাপক মার্শালের সহকারী অফিসে আসেনি সেদিন। তিনি নিজেই আমাকে রিসেপশন রুমে অভ্যর্থনা জানালেন।

তিনি বললেন, 'আজ বিকেলে তুষারপাতের জন্য অফিস বন্ধ করে দিয়েছি। তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আমার হাতে অনেক সময়. তোমার সাথে কথা বলবো।'

অধ্যাপক মার্শাল স্কটল্যান্ডের অভিবাসী। আমার মতোই এদেশে এসেছেন। চল্লিশ বছর আগে। এসেছিলেন রিসার্চ এসোশিয়েট হিসেবে। অনেকের সাহায্য পেয়েছিলেন শুরুতে। আর তাই আমাদের মতো তরুণ বিদেশী চিকিৎসকদের তিনি সহায়তা করেন। আফ্রিকা থেকে এসেছি জেনে খুব উৎসাহিত হলেন। প্রত্যন্ত গ্রামের ক্লিনিকে হেপাটাইটিসের ওপর কাজ করেছি জেনে আরো খুশি হলেন।

আমাকে সাথে সাথে রিসার্চ এসিট্যান্ট হিসেবে কাজ দিয়ে দিলেন। আমি আবেগাপ্লুত হয়ে গেলাম। আমাকে খুব চমৎকার একটি রেফারেন্স লেটার দিয়েছিলেন তিনি। যা আমার পেশাগত জীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে সারাজীবন। আমার পড়াশোনার বাইরেও প্রচুর ব্যাক্তিগত পরামর্শ দিতেন তিনি। খানিকটা বাবার মতো।

সেই থেকে আমার পেশাগত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমি অধ্যাপক মার্শালের পথ ধরে তরুণ চিকিৎসকদের সাহায্য করার চেষ্টা করি। বাংলাদেশের তিনজন তরুণ চিকিৎসক এখানে কাজ করছে। আরো অনেকে এখানে আসবে কাজ করতে। অনেকেই আসতে চাইলেও সবাইকে সুযোগ দিতে পারি না। এরা খুবই প্রতিভাবান। এদের সাহায্য করতে পেরে ভালো লাগে।

পৃথিবীর আলো আঁধারে

মারিয়াকে চিনি গত ১৫ বছর ধরে।

তার হাস্যময় প্রতিবন্ধী ছেলে হোজেকেও চিনি একই সময় ধরে। মারিয়ার বয়স হয়েছে। আজকাল হোজের পরিচর্যা করতে পারেন না। হোজে একটি নার্সিংহোমে থাকে। ভালোই আছে সে। মারিয়া প্রতিদিন দেখতে যায় তাকে। ডাক্তারের অফিসে নিয়ে যায়। প্রিয় লাটিন রেস্তোরাঁতে যায়, ডিজনি ওয়ার্ল্ডে যায়।

মারিয়ার স্বামী আলবার্ট গত দুব'ছর হলো স্মৃতিভ্রংশে ভুগছে। মারিয়ার পক্ষে তাকেও দেখভাল করা বড়ো কঠিন। একমাত্র কন্যা তেরেসা তার পরিবারসহ নিউ জার্সিতে থাকে। ৫০ বছরের যৌথ জীবনে মারিয়া আর আলবার্ট সব সময়ই একসাথে থেকেছে। দু'জনেই কোভিডের ভ্যাকসিন নিয়েছেন।

দু'জনেই একটি একটি দীর্ঘ মেয়াদী অবসর হোমে জায়গা করে নিয়েছেন। একরুমের ঘর। পরিচর্যার জন্য মানুষ আছে। ওষুধপত্র নার্স দিয়ে যায়। খাবার দাবারও সেখানেই সরবরাহ করা হয়।

জীবনের জটিলতা কমে যাচ্ছে মারিয়ার।

ছোট জায়গা ছোট বাড়ি। মারিয়া এসব নিয়ে সুখি হতে শিখেছে অনেকদিন আগেই। সে হয়তো বুঝে গেছে, জীবন এমনই। এক সময় ছোট্ট জায়গা থেকে শুরু হয়, আবার ক্রমেই ছোট হয়ে আসে। অথচ আমাদের কতো অপ্রাসঙ্গিক জটিলতা জীবনের। আমাদের অনেকেরই সুখের জন্য কতো জটিল সমীকরণের মাঝে যেতে হয়!

মারিয়ার জীবনের সমীকরণ বড়ো সহজ! অথচ একই পৃথিবীর আলো আঁধারে আমরা!

–সমাপ্ত–

ফ্ল্যাপ

বি এম আতিকুজ্জামানের সঙ্গে আমার পরিচয় চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজে যখন সে ছাত্র। আমি অধ্যাপক। তখন থেকে তার প্রতিভার স্ফূরণ দেখে আমার মনে হয়েছিল এই ছেলে একদিন জগতজোড়া খ্যাতি অর্জন করবে আর বাস্তবে হলোও তাই। ছোটবেলা থেকে লেখালেখি, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের একনিষ্ঠ কর্মী, আলোকিত মানুষ হবার বাসনা যা স্বপ্ন ছিল তার একদিন, তা আজ সত্য।

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের এই লেখা পড়ায় ভালো ছেলেটি সাহিত্য সংস্কৃতি অঙ্গণে ছিল অনন্য, রাজনীতিতে তুখোড়।

আতিক নজর কাড়ে সবার। ও এমন একজন, যাকে ভিড়ের মধ্যে চেনা যেত আলাদা ভাবে। এরপর তার শুধু এগিয়ে যাওয়া, দেশে বিদেশে উচ্চশিক্ষা। অবশেষে আমেরিকাতে থিতু হয় আতিক। এখন পরিপাকতন্ত্র বিশেষজ্ঞ হিসাবে আমেরিকা জোড়া নাম তার। সেখানকার বাঙ্গালিদের মধ্যে, বাঙ্গালি চিকিৎসকদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় হয়ে ওঠে সে ধীরে ধীরে। আমেরিকা ও বাংলাদেশের চিকিৎসা-শিক্ষার মধ্যে একটি সুসম্পর্ক স্থাপন ও জ্ঞানের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রেও ক্রমেই সে পৌঁছে যাচ্ছে পথিকৃৎ পর্যায়ে।

এত ব্যস্ততার ভেতরও সব সময় সরব তার কলম। তার কলমে, তার লেখায় সুনিপুনভাবে উঠে আসে সমাজের নানা চালচিত্র। মানুষ ও যাপিত জীবন তার লেখায় ধরা দেয় দারুণ বাস্তবতায়। আমি দৃঃভাবে বিশ্বাস করি প্রথম বই হিসাবে তার লেখা 'অরলান্ডোর চিঠি' হবে সবার জন্য রুদ্ধ শ্বাসে পড়ার মত একটি বই। বইটা পড়লেই আমার সাথে একমত হবেন।

-অধ্যাপক শুভাগত চৌধুরী

লেখক পরিচিতিঃ

বি এম আতিকুজ্জামান

লিপ ইয়ারে জন্ম এই বিস্ময় বালকের। ২৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৮।

বড়ো হয়েছেন ঢাকায়। লেখাজোখার ঝোঁক ছিল সবসময়। প্রথম লেখা মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলের একটি দেয়াল পত্রিকায়। ঢাকা কলেজে পড়বার সময় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে যাওয়া আসা ছিলো নিয়মিত। সে সময় বিভিন্ন পত্রিকাতে নিয়মিত লিখতেন কবিতা, ছোট গল্প। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে টানা তিন বার সাহিত্য সম্পাদক থাকা কালে নিয়মিত কবিতা, প্রবন্ধ, ছোট গল্প লিখেছেন অনিয়মিত ভাবে। তবে সম্পাদনা করেছেন নিয়মিত।

এরপর আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ হয়ে, নিউ ইয়র্কে স্নাতকোত্তর পড়াশুনা আর প্রশিক্ষণ নিয়ে ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোতে আছেন গত দু দশক। জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন আমেরিকাতে। একজন পরিপাকতন্ত্র এবং লিভার বিশেষজ্ঞ হিসেবে আমেরিকা জোড়া তাঁর নাম। একইসাথে তিনি পর্যটক, শিক্ষক, সমাজসেবক এবং দেশে বিদেশে পরবর্তী প্রজন্মের চিকিৎসকদের সুযোগ্য মেন্টর।

দীর্ঘদিন পর আবার লেখালেখি শুরু করেছেন গত কয়েক বছর ধরে। বিভিন্ন পত্রিকা এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লেখেন অনুগল্প, প্রবন্ধ, কবিতা। 'অরলান্ডোর চিঠি' নামের একটি কলামে তিনি নিয়মিত লেখেন তাঁর প্রতিদিনের ছোট ছোট অভিজ্ঞতার গল্প। এক জীবনের গল্প। সেসব ছোট ছোট দিনলিপি নিয়ে তিনি 'অরলান্ডোর চিঠি' প্রকাশ করছেন।

এটিই তাঁর প্রথম বই। তাঁর লেখাতে একজন বৈশ্বিক চিকিৎসকের চিকিৎসা বিজ্ঞানের বাইরের পরিমণ্ডলের অনেক কিছু ফুটে উঠেছে। সাধারণ মানুষের জীবনের প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ। আর তাই তাঁর চারপাশের মানুষের জীবন, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না কখনো সহজ, কখনো অস্থির, কখনো ভাবলেশহীনভাবে তার লেখায় ফুটে উঠেছে।